দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় ও সরোজিনী নাইডু : একটি ঐতিহাসিক বিতর্ক

.. পৃঃ ১২

বিশ্বকে পথ দেখানোর জন্য ভারতকে দাঁড়াতে হবে : মোহন ভাগবত

.. পৃঃ ২৯

৬৭ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা।। ২০ এপ্রিল ২০১৫।। ৬ বৈশাখ - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

পশ্চিমবঙ্গে পুরসভা নির্বাচন

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা, ৬ বৈশাখ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
২০ এপ্রিল - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯
ভুল তথ্য প্রচার করে জমি বিল নিয়ে কৃষকদের বিভ্রান্ত করছে বিরোধিরা □ গূঢ়পুরুষ □ ১০
খোলা চিঠি : বেশ করেছি ছবি বেচেছি, বেচবই তো... □ সুন্দর মৌলিক □ ১১
পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় ও সরোজিনী নাইডু : একটি ঐতিহাসিক বিতর্ক □ ড: প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় □ ১২
পশ্চিমবঙ্গে পৌর পরিষেবার হাল হকিকত □ দেবব্রত ঘোষ □ ১৪
পৌরসভাগুলির নির্বাচন— যাত্রা শুরুর আহ্বান □ দেবব্রত চৌধুরী □ ১৭
পুরসভাগুলির নির্বাচন : ভবিষ্যতের রূপরেখা □ অম্লানকুসুম ঘোষ □ ১৮
শাশ্বত জীবনমূল্যবোধের নাম 'গীতা' □ শবরী ঘোষ □ ২১
জমি আন্দোলনের ধ্বজাধারীরা ভুলে যাচ্ছে চাষির ছেলেও চাকরি চায় □ গুরুশরণ দাস □ ২৭
বিশ্বকে পথ দেখানো জন্য ভারতকে দাঁড়াতে হবে : মোহন ভাগবত □ ২৯
সাক্ষাৎকার : দীননাত বত্রা ঃ 'সত্য ইতিহাস পড়ানো যদি গৈরিকীকরণ হয়, তাহলে তা খুবই জরুরি' □ ৩০
আন্তর্জাতিক যোগদিবসে ভারতসংস্কৃতির বৈচিত্র্য তুলে ধরা হবে বিশ্বের কাছে □ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮** □ **খেলা : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **চিত্রকথা : ৪১** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রাষ্ট্রীয় সেবা সঙ্গম - ২০১৫

দেশজুড়ে আর এস এস এবং তার সমমনোভাবাপন্ন বহু প্রতিষ্ঠান সেবামূলক কাজ করে চলেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামোন্নয়ন, স্বাবলম্বন, সামাজিক সহমর্মিতা নির্মাণ ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে তাদের কাজকর্ম বিস্তৃত। সেবাকাজে মগ্ন এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার জন্য গঠিত হয় রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী। সম্প্রতি দিল্লীতে এরই উদ্যোগে হয়ে গেল রাষ্ট্রীয় সেবা সঙ্গম। বিশালতায় ও বৈচিত্র্যের যা অনন্য। এই বিষয় নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধ— রাষ্ট্রীয় সেবা সঙ্গম।

HB®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

HB®
AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

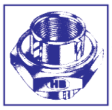
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®
শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নেতাজী পরিবারের উপর নজরদারি

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু-কে লইয়া জাতীয় রাজনীতি এখন তোলপাড়। তাঁহার স্নেহধন্য দুই ভ্রাতুষ্পুত্র অমিয়নাথ ও শিশিরকুমার বসুর গতিবিধির উপর ১৯৪৮ হইতে ১৯৬৮—এই দুই দশক ধরিয়া নজরদারি চালাইয়াছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সরকার। সম্প্রতি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের দুইটি গোপন ফাইলের এই তথ্য প্রকাশ হওয়াতেই তুঙ্গে উঠিয়াছে বিতর্ক ও পারস্পরিক দোষারোপের পালা। নেতাজী সম্পর্কে সর্বাধিক প্রচারিত তত্ত্ব হইল ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হয়। বৃটিশ সরকারের ফিগেশ কমিশন (১৯৪৬) এবং স্বাধীনতার পর নেহরু সরকার গঠিত শাহনওয়াজ কমিশনের রিপোর্টেও একই কথা বলা হইয়াছে। তাহার পরেও নেতাজী পরিবারের উপর নজরদারি কেন, বিশেষত ওই দুইজনের কেহই যখন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না—সেই প্রশ্ন আজ উঠিয়াছে। মূল প্রশ্ন একটাই— নজরদারির উদ্দেশ্য কী ছিল?

দেশে বিদেশে বসবাসকারী বসু পরিবারের সদস্যদের দাবি, বিদেশ মন্ত্রকে ২৯টি ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ৫৮টি নেতাজী সংক্রান্ত গোপন ফাইল রহিয়াছে। সেইসব ফাইলগুলি প্রকাশ করা হউক। কেননা সুভাষচন্দ্র বসু শুধু একটি পরিবারের নয়। সুভাষচন্দ্র নিজেই বলিয়াছিলেন, সমগ্র দেশই তাঁহার পরিবার।

ঘটনা হইল, ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও একনাগাড়ে কংগ্রেস শাসনই ছিল। ফলে নজরদারির দায় সর্বতোভাবেই কংগ্রেসের উপর পড়িয়াছে। সরকারি গোয়েন্দাদের আতস কাঁচের তলায় সাধারণভাবে যে কেহ হঠাৎ করিয়া আসিয়া পড়েন না। কিন্তু আইবি-র ফাইলই বলিতেছে, বসু পরিবারের উপর রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা শাখা নজর রাখিত। সেই সময় রাজ্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সরকার ছিল। সেই সরকারেরই গোয়েন্দা শাখা কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা বাহিনীকে রিপোর্ট পাঠাইয়াছে। সেই সময় দেশবাসীর একটি বড় অংশ বিশ্বাস করিত, নেতাজী বাঁচিয়া আছেন। বিমান দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। যে কোনোদিন তিনি ফিরিয়া আসিবেন। ইহা ব্যতীত, কংগ্রেসে থাকাকালীন নেহরু-নেতাজী মতান্তরের বিষয়টিও জনস্মৃতিতে ছিল। কেহ কেহ মনে করিতেন, নেতাজী জীবিত এমন একটা সন্দেহ সরকারের অন্দরেও ছিল। আর একটি অংশের দাবি, নেতাজী সংক্রান্ত কোনও স্পর্শকাতর তথ্য নেতাজী পরিবারের হাতে আসিয়াছে কিনা, তাহা জানাই ছিল নজরদারির উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলির চিঠিপত্র পড়িলেই বোঝা যায়, নেহরু চাহিতেন না যে নেতাজী স্বাধীন ভারতে ফিরিয়া আসুন।

নেতাজী যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিতে অর্থ সাহায্য চাহিয়াছিলেন, প্রবাসী বাঙালিরা কোটি কোটি টাকা, মহিলারা অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া দিয়াছিলেন। সেইগুলি রাখা ছিল ১৮টি বড় বড় ট্রাঙ্কে। সেই টাকা ভারতে আসিবার পর অনেকেরই ধারণা ছিল, তাহা নাকি ছিল নেহরুর হাতে। সেই টাকা ফেরত দেওয়ার ভয়ও নাকি কাজ করিত তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর মনে। এই বিষয়ে অবশ্য সত্য-মিথ্যা ইতিহাসই বলিবে।

বস্তুত জওহরলাল নেহরুর সময় হইতেই গোয়েন্দাগিরির রেওয়াজ শুরু করিয়াছিল কংগ্রেস। ইন্দিরা গান্ধীর আমলেও দেখা গিয়াছে তাঁহার নিজের পুত্রবধূ (মানেকা)-র উপর নজরদারি। সম্প্রতি মনমোহন সিং-এর জমানাতেও কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী দপ্তরেও চ্যুইংগাম লাগাইয়া গোয়েন্দাগিরি করা হইয়াছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব ও আচরণ কতটা নেতিবাচক তাহা এইসব ঘটনাতেই প্রমাণিত। নেতাজী সমগ্র দেশবাসীর কাছে একজন নায়ক। তাঁহার বিরুদ্ধে যে কোনো চক্রান্তের আভাস মানুষ সহ্য করিবে না। তাই অবিলম্বে নেতাজী পরিবারের উপর নজরদারি লইয়া সত্য উদঘাটনে পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ তদন্ত হওয়া উচিত।

সুভাষিত

নাত্যুচ্চশিখরো মেরুর্নাতিনীচং রসাতলম্।
ব্যবসায়দ্বিতীয়ানাং নাত্যপারো মহোদধিঃ।।

পরিশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে মেরুপর্বতের শিখর খুব উঁচু নয়, পাতাল খুব নীচু নয় এবং মহাসাগর লঙ্ঘন করা খুব কঠিন নয়।

কেন্দ্রের কাশ্মীরি-উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প বানচালে আই এস আই-এর ষড়যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কাশ্মীর উপত্যকা থেকে কি এবার জম্মু-র ভূমিতে নেমে এল সন্ত্রাসবাদী-নিশানা? সাম্প্রতিক গোয়েন্দা রিপোর্ট এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনা পর্যালোচনা করে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর নয়া পরিকল্পনা মাফিক-ই বদলে গিয়েছে সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্যবস্তু। তারা কেন্দ্রের এন ডি এ সরকার ঘোষিত অভিবাসী কাশ্মীরিদের পুনর্বাসন প্রকল্পে সায় না দেবার জন্য এদের প্ররোচিত করছে। গোয়েন্দা-সূত্রের খবর, আই এস আই তাদের এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ভার দিয়েছে হিজবুল মুজাহিদিন ও লস্কর-ই-তৈবার ওপর। জম্মু-র এলাকায় সন্ত্রাসবাদী হামলা পরিচালনার দায়িত্বও এদের দেওয়া হয়েছে বলে খবর। হামলাগুলি এতদিন মূলত কাশ্মীর উপত্যকাতেই সংঘটিত হয়ে এসেছে। এমনও সংবাদ এসেছে যে এই পাক গুপ্তচর সংস্থা পুঞ্চ, রাজৌরি, সাম্বা প্রভৃতি জম্মুর বিভিন্ন এলাকার সন্ত্রাসী হামলা চালানোর জন্য উচ্চ-প্রশিক্ষিত ২০ জনের ফিঁদায়ে (আত্মঘাতী) গোষ্ঠী গঠন করেছে। আই এস আই-এর পরিকল্পনা, লস্করের ২০টি গোষ্ঠীকে একে একে জম্মুর এলাকায় অনুপ্রবেশ করিয়ে পুলিশ থানা ও সেনা- পোস্টগুলির ওপর হামলা চালানো। এর ফলে রাজ্য জুড়ে যে অশান্তি-র সৃষ্টি হবে, তার ফলে কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা আর কেন্দ্রের নয়া পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণে ইচ্ছুক হবে না। এমনটাই পরিকল্পনা পাকগুপ্তচর সংস্থার। পুঞ্চ, রাজৌরি কিংবা সাম্বা-র মতো জম্মু-র এলাকায় এরকম একটি লস্কর গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই প্রবেশ করে ফেলেছে বলে গোয়েন্দা-সূত্রে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে।

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা এমনটাও মনে করছেন যে হিজবুল মুজাহিদিন এবং লস্কর-এ-তৈবার কাছে এই নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে যে জম্মু-র হিন্দুদের ওপর হামলা চালাতে, যাতে কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা জম্মু উপত্যকায় প্রত্যাবর্তনের আগে দু'বার ভাবেন। এর ফলে সন্ত্রাসবাদীদের অনেকটা কাজও হাসিল হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনে জম্মু-র যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিজেপি-কে ভোট দিয়েছিলেন এবং বর্তমানে বিজেপি-পিডিপি জোটের সমর্থক তাদের মনেও ভয় ধরিয়ে দেওয়া যাবে। আশ্চর্যজনকভাবে গত আর্থিক বছরে কাশ্মীরি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্র যে ৫০০ কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করেছিল আপাতত তাতে সাড়া মিলেছে একটিমাত্র পরিবারের। বিজেপি সরকারের পুনর্বাসন প্রকল্প ঘোষণার পরে জম্মুতে সবচেয়ে বড়ো আক্রমণটি হয় গত বছরের ২৭ নভেম্বর। সেদিন আরনিয়ায় নাগরিকদের ওপর ফিঁদায়ে হামলা এবং এবছরের ২০ মার্চ কাথুয়ায় পুলিশ থানার ওপর জেহাদি হামলা এবং পরের দিন সাম্বায় একটি সেনা-ক্যাম্পের ওপরও আক্রমণ শানায় সন্ত্রাসবাদীরা।

ভারতে অনুপ্রবেশ করে চার সদস্যের ফিঁদায়ে স্কোয়াড গত ২৭ নভেম্বর আরনিয়ায় যে হামলা চালিয়েছিল প্রায় ৩২ ঘণ্টা ধরে তাতে তিন জওয়ান ও পাঁচ নাগরিক মিলে মোট আটজন প্রাণ হারান। ২০ মার্চে দুই ফিঁদায়ে কাথুয়া জেলার রাজবাগ পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা চালিয়ে নিরাপত্তারক্ষী-সহ পাঁচজনের প্রাণ কেড়ে নেয়। পাল্টা গুলিতে তাদেরও মৃত্যু হয়। ২১ মার্চের ঘটনায় দুই ফিঁদায়ে সাম্বা সেনা-ক্যাম্পকে আক্রমণের নিশানা করলেও সফল হতে পারেনি।

কেন্দ্র কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ঘরে ফেরাতে যে বহুমুখী উদ্যোগ নিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে তাদের গৃহ-নির্মাণের অনুদান বাড়ানো ও রাজ্যে পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরির সুযোগ করে দেওয়া। বর্তমানে দেশে নথিভুক্তকৃত কাশ্মীরি উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা ৬০,৪৫২। এর মধ্যে প্রায় ৩৮,১১৯টি পরিবার জম্মুতে থাকে। দিল্লীতে থাকে ১৯,৩৩৮টি পরিবার। ১,৯৯৫টি এধরনের পরিবার দেশের অন্যান্য রাজ্যে বাস করে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটির দাবি

নিরাপত্তার স্বার্থে আঙ্গারপোতা-দহগ্রামকে ভারতে রেখে ছিট বিনিময় হোক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উত্তরবঙ্গের সীমান্ত দর্শনে এসে তিনবিঘা করিডর ও কুচলিবাড়ির বালাপুকুরি ছিটমহল সংলগ্ন সীমান্ত পরিদর্শন করে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। হ্যালিপ্যাড থেকে তিনবিঘা করিডরে আসার সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাতে স্পষ্ট করে সীমান্ত বুঝতে পারেন তার জন্য সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর পক্ষে জিরো লাইন বরাবর সাদা পতাকা লাগিয়ে সীমান্ত চিহ্নিত করে রাখা হয়েছিল। হ্যালিপ্যাড থেকে তিনি সরাসরি চলে যান বালাপুকুরীর পুকুর পাড়ে বিএসএফের তৈরি করা অস্থায়ী তাঁবুতে। সেখান থেকেই তিনি সাদা পতাকা দিয়ে সীমানা চিহ্নিত করে রাখা বাংলাদেশের ছিটমহল পরিদর্শন করেন।

এই তাঁবুতেই পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুসারে ছিটমহল ও ভারত বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য ডাক পড়ে কুচলিবাড়ির সংগ্রাম কমিটির প্রতিনিধি দলের। এই প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন কমিটির তিনজন কর্মকর্তা গিরিনাথ রায়, উৎপল কান্তি রায়, অশ্বিনী রায়-সহ কমিটির দু'জন উপদেষ্টা সাধন কুমার পাল ও সতীশ চন্দ্র বর্মন। তেঁতুলিয়া করিডর নিয়ে স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য সঞ্জীব বিশ্বাস ও পার্টির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি দীপেন প্রামাণিক। কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দাবি তোলা হয় ছিট বিনিময় হলে তিনবিঘা করিডর বিলোপ করে আঙ্গারপোতা-দহগ্রাম ভারতের দিকে রেখে ছিট বিনিময় করতে হবে। কারণ এই বাংলাদেশি ছিট দুটি ভারতের নিরাপত্তার জন্য সাংঘাতিক বিপজ্জনক। বাংলাদেশ ঘেরা ১৫২৯১.২৫ একর আয়তন বিশিষ্ট কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রবেশের একমাত্র পথ তিনবিঘা করিডর। ১৯৯২ সালের ২৬ জুন তিনবিঘা করিডর হস্তান্তরের পর থেকে কুচলিবাড়ির মানুষের মনে 'ভবিষ্যতে তাদের এই এলাকা বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে না তো?' এরকম একটি চোরা সংশয় আতঙ্ক দেখা দেয়। এই আতঙ্কে কুচলিবাড়ির মানুষ যে এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছে তা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ওই এলাকার জনসংখ্যার পরিসংখ্যানে। ১৯৮১-এর জনগণনা রিপোর্টে কুচলিবাড়ির জনসংখ্যা ছিল ৩৫ হাজারের কাছাকাছি। ২০১১ সালের সেনসাসে ওই জনসংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ২৩৭৫৬ জন। অর্থাৎ তিনবিঘা করিডরের উপস্থিতি কুচলিবাড়ি এলাকাকে নতুন করে ছিটমহলে পরিণত করছে। এর জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি বা তিন বিঘা করিডরের লিজ বাতিল করার লক্ষ্যে কথা শুরু করার অনুরোধ জানানো হয়।

গোরু পাচার, চোরা কারবার বন্ধ করে সীমান্তের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার আর্জি জানানো হয়। যতদিন ছিট বিনিময় না হয় ততদিন ভারতীয় ছিটমহলের বাসিন্দাদের দেশের মূল ভূখণ্ডে যাতায়াতের জন্য বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্র ও ওই ছিটগুলিতে বাংলাদেশি মৌলবাদী শক্তির আগ্রাসন বন্ধের আর্জি জানানো হয়। কুচলিবাড়ির বাজার বাংলাদেশি তামাকে ছেয়ে যাওয়ার জন্য ভারতীয় চাষিরা বাজারে ন্যায্য দামে তামাক বিক্রি করতে পারছে না, কাঁটা তাদের বেড়ার ওপারে ভারতীয় চাষিরা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের দাপটে চাষ করতে পারছে না— এই সমস্ত ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ছিটমহল পরিদর্শনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং।

চোরা কারবার, কাঁটাতারের বেড়ার ওপারের জমিতে, এমনকী বেড়া লাগোয়া জমিতে ভারতীয় কৃষকরা চাষবাস করতে গিয়ে বাংলাদেশি দুর্বৃত্তদের আগ্রাসন ও বিএসএফের নানা বিধিনিষেধ-মূলক সমস্যা-সহ সীমান্তের নানা সমস্যা তথ্য সহকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হয়। কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে ছিটমহল ইউনাইটেট কাউন্সিলের পক্ষ থেকেও একটি স্মারকলিপি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। বালাপুকুরী থেকে ফেরার সময় রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্থানীয় মানুষ বন্দেমাতরম্, ভারতমাতা কী জয় ধ্বনি দিয়ে অভিবাদন জানাতে থাকলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং কনভয় থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে জনতার অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং অনেকের সঙ্গেই করমর্দন করে বার্তা দেন আমি তোমাদেরই একজন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এভাবে নিজেদের মধ্যে পেয়ে স্থানীয় মানুষ আপ্লুত।

ডাঃ হেডগেওয়ারের জীবনী ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করল কেন্দ্র সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এনডিএ সরকার ২০১৪-তে ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম আর এস এস-এর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার (ডাক্তারজী)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হলো। সংবাদে প্রকাশ, ২০০৩ সালে হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতার জীবনীটির অনুবাদের মাধ্যমেই তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকের এই প্রথম প্রয়াস।

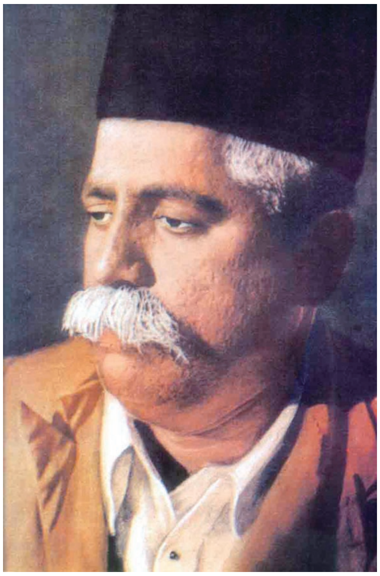

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আরও দু'ই প্রবাদপ্রতিম পথ প্রদর্শক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী) ও বালাসাহেব দেওরসের জীবনী সরকারি প্রকাশনা বিভাগের মাধ্যমে প্রকাশের তোড়জোড় চলছে। প্রসঙ্গত এই প্রকাশনা বিভাগ (Publication Division) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনেই কাজ করে থাকে। প্রখ্যাত সঙ্ঘ ব্যক্তিত্বদের (যাঁরা বরাবর ভারতের সামাজিক ইতিহাস অবহেলিত থেকে গেছেন) কর্মকাণ্ডের হদিশ সঠিকভাবে জনগণের মধ্যে তুলে ধরতে এই জাতীয়তাবাদীদের জীবনী নানান ভাষায় অনুবাদ করার জন্য উপযুক্ত অনুবাদকদের নাম নথিভুক্ত করা শুরু হয়েছে। ডাঃ হেডগেওয়ারের জীবনীর সাম্প্রতিক অনুবাদটি সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতকে মুগ্ধ করেছে। তিনি গ্রন্থটির অনুবাদক দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা India Policy Foundation- এর অধিকর্তা রাকেশ সিনহার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

উল্লেখিত ইংরেজি সংস্করণটিতে ১৬টি সেপিয়া রঙের দুষ্প্রাপ্য ছবিও সংকলিত হয়েছে। এগুলির মাধ্যমে তাঁর প্রথম জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে জীবনের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজকর্মের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। অধ্যাপক সিনহার বক্তব্য অনুযায়ী, এর আগে বামপন্থী ঐতিহাসিকরা ডাঃ হেডগেওয়ারকে যথাযথভাবে তুলে ধরেনি, বরং তাঁকে বৃটিশের অনুরাগী বলেই দেখানো হয়েছিল। এই সব ভুলগুলিকে সঠিক সংশোধন করাই আশু কর্তব্য বলেই মন্ত্রক মনে করছে।

২০৫০ সালের মধ্যে ভারত পৃথিবীর সর্বাধিক মুসলমানের বাসস্থান হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মার্কিন মুলুক থেকে বিখ্যাত গবেষণা সংস্থা পিউ-র প্রতিবেদন (Pew Report) অনুযায়ী মুসলমানরা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে দ্রুত তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। তথ্য অনুযায়ী ২০১০ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২১৭ কোটি ছিল (২.১৭ বিলিয়ন) খৃষ্টান এবং মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ১৬০ কোটি (১.৬ বিলিয়ন)। এই সংখ্যা ২০৫০ সালে দ্রুতগতিতে বেড়ে খৃষ্টান জনসংখ্যাকে ধরে ফেলবে। ২০৫০-এ খৃষ্টান জনসংখ্যা হবে ২৯০ কোটি (২.৯ বিলিয়ন) যা সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার ৩১ শতাংশ। সেই জায়গায় মুসলমান সংখ্যা দাঁড়াবে ২৮০ কোটি (২.৮ বিলিয়ন) যা শতাংশের হারে বিশ্ব জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ। বিশেষজ্ঞ মহলের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৭০ সালের পর পৃথিবীতে ইসলাম অনুগত মানুষের সংখ্যা হবে সর্বাধিক। ইতিমধ্যে ২০৫০ সালের মধ্যেই মুসলমানরা সমগ্র ইয়োরোপীয় জনসংখ্যার ১০ শতাংশ হয়ে যাবে যা ২০১০ সালে ছিল মাত্র ৫.৯ শতাংশ।

প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী হিন্দুরা ২০৫০ সালে আনুমানিকভাবে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ধর্মের শিরোপা পাবে। বিশ্বব্যাপী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। ২০১০ এর ১০০ কোটি (১ বিলিয়ন) থেকে এই সংখ্যা পৌঁছবে ১৪০ কোটিতে (১.৪ বিলিয়নে)। ওয়াশিংটনের পিউ গবেষণা সংস্থা এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

২০৫০ সালে, তথ্য অনুযায়ী বিশ্বে হিন্দু ধর্মবিশ্বাসীরা হবে মোট জনসংখ্যার ১৪.৯ শতাংশ। ধর্মবিশ্বাসহীন মানুষের সংখ্যা দাঁড়াবে বিশ্ব জনসংখ্যার ১৩.২ শতাংশ। এই ধর্মবিশ্বাসহীন মানুষদের বিশ্ব জনসংখ্যার নিরিখে বর্তমানের তৃতীয় স্থানে থাকাকে সরিয়ে হিন্দুধর্মাবলম্বীরা সেই স্থান দখল করবে বলে অনুমান। প্রসঙ্গত ২০৫০ সালে ভারত হিন্দু সংখ্যাধিক্যের দেশ থাকলেও আজকের ইন্দোনেশিয়ার সর্বাধিক মুসলমান বসবাসের তকমা কেড়ে নিয়ে বিশ্বের সর্বাধিক মুসলমান ভারতেই বসবাস করবে। তথ্য অনুযায়ী এই কালসীমায় ইউরোপে বসবাসকারী হিন্দুদের সংখ্যাও আজকের সমগ্র ইউরোপীয় জনসংখ্যার ০.২ শতাংশ থেকে দ্বিগুণ অর্থাৎ ০.৪ শতাংশে দাঁড়াবে যা ২.৭ মিলিয়নের কাছাকাছি। ব্যাপক অভিবাসনের সূত্রেই ইউরোপে এই হিন্দু সংখ্যাধিক্য ঘটবে বলে অনুমান।

স্বস্তিকা'র নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ মালদহে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ স্বস্তিক'র 'উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন' শীর্ষক নববর্ষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল গত ১২ এপ্রিল, মালদহ শহরের রামকল্যাণ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের প্রশস্ত হলঘরে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা-অধ্যাপক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর আজীবন কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তৃতীয় 'স্বস্তিকা সম্মান' প্রদান করা হলো। এদিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় মাধবনগর

নববর্ষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উন্মোচন।

মানপত্র দিয়ে সম্মান জানানো হচ্ছে রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওই স্কুলেরই সহ-শিক্ষক শান্তনু চট্টোপাধ্যায়। প্রধান বক্তা ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র কার্যকারিণী-র সদস্য তথা স্বস্তিকা'র অন্যতম ট্রাস্টী সত্যনারায়ণ মজুমদার।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন পত্রিকা'র সহ-সম্পাদক নবকুমার ভট্টাচার্য। স্বস্তিকা'র এই বিশেষ সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি শান্তনু চট্টোপাধ্যায়। তাঁর হাতে পত্রিকাটি তুলে দেন সম্পাদক বিজয় আঢ্য। তাঁর বক্তব্যে শান্তনুবাবু বলেন : 'পত্রিকা হলো সমাজের দর্পণ। স্বস্তিকা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের জীবনের সার্থকতা।'

রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলম, উত্তরীয়, ফুলের তোড়া, থালা, শ্রীফল-সহ পাঁচটি ফল, মানপত্র দিয়ে স্বস্তিকা'র পক্ষ থেকে সম্মানিত করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মানপত্রটি পড়ে শোনান অভিজিৎ চক্রবর্তী। দৃশ্যতই আবেগমথিত রথীনবাবু বলেন : 'আমি অভিভূত। আমার সাংবাদিক জীবনের গোড়াপত্তন স্বস্তিকা'য়। এই পত্রিকা আমায় পথ চলতে শিখিয়েছে। ভবেন্দু ভট্টাচার্যের কাছে পেয়েছি দিগ্‌নির্দেশ। আমার আদর্শকে লোভে প্রলোভনে বিকিয়ে দিইনি। তাই পেশাগত জীবনের এই স্বীকৃত মানদণ্ড আমায় আবেগতাড়িত করছে।'

উপস্থিত অভ্যাগতদের একাংশ।

ভুল তথ্য প্রচার করে জমি বিল নিয়ে কৃষকদের বিভ্রান্ত করছে বিরোধীরা

একটা কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায় যে গত দশ মাসে কেন্দ্রের মোদী সরকার কী করেছে। নরেন্দ্র মোদী আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি আম জনতার জন্য 'আচ্ছে দিন' আনবেন। প্রশ্ন উঠছে, সত্যি কি মনমোহন জমানার নীতির বদল হয়েছে? উত্তর এক কথায়, হ্যাঁ। যেমন, মনমোহন জমানায় আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি হয়েছিল। সুযোগ বুঝে চীন শ্রীলঙ্কায় যথেষ্ট প্রভাব বৃদ্ধি করে। সেই সময় শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি ছিলেন মহিন্দ্রা রাজাপক্ষে। তিনি ভারতের বিরোধিতা করতে চীনকে বন্ধু হিসেবে তাঁর দেশে আমন্ত্রণ জানান। শ্রীলঙ্কায় চীনকে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেন। চীনা নৌবাহিনীর পারমাণবিক ডুবো জাহাজগুলিকে কলম্বোর বন্দরে নোঙর ফেলার অধিকার দেন রাজাপক্ষে। ভারত মহাসাগরে চীনের দাদাগিরি শুরু হয় শ্রীলঙ্কার সৌজন্যে। মনে রাখতে হবে যে ভারত মহাসাগরের পথেই ভারতের প্রয়োজনীয় ৮৫ শতাংশ জ্বালানি তেল আসে। ভারত মহাসাগর যে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করবে সেই রাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কর্তৃত্ব করবে। মহিন্দ্রা রাজাপক্ষের হাত ধরে চীন ভারত মহাসাগরে আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিল।

মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতির বদল হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মহিন্দ্রা রাজাপক্ষে পরাজিত হন। জয়ী হন মৈত্রীপালা সিরিসেনা। এই জয়ের পিছনে আছে সেখানের সংখ্যালঘু তামিল সম্প্রদায়। রাজাপক্ষের তামিল গণহত্যার প্রতিবাদে শ্রীলঙ্কার তামিলরা একজোটে মৈত্রীপালাকে ভোট দেন। মৈত্রীপালা একদা রাজাপক্ষের মন্ত্রিসভায় ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভারত-বিরোধী নীতির প্রতিবাদে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পরে 'চীন নয়, ভারতই শ্রীলঙ্কার প্রকৃত বন্ধু'— এই শ্লোগান দিয়ে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাজাপক্ষের বিরুদ্ধে প্রার্থী হন। রাজাপক্ষে চাইছিলেন শ্রীলঙ্কার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব চীনের হাতে তুলে দিতে। তাঁর বিশ্বাস ছিল চীনের হাতে শ্রীলঙ্কার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থাকলে ভারত

গূঢ় পুরুষের কলম

সমঝে চলবে। ভোটের ফলাফল বুঝিয়ে দিচ্ছে যে শ্রীলঙ্কার সাধারণ মানুষ ভারতকেই বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে চান। চীনকে নয়। মৈত্রীপালা সিরিসেনা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পরেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে ভারত সফরে আসার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানান। মোদীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মৈত্রীপালা সিরিসেনা তাঁর বিদেশ সফরের সূচনা করেন ভারত যাত্রা দিয়ে। এই সফর যে যথেষ্ট সফল হয়েছে তার প্রমাণ দেশে ফিরেই চীনকে শ্রীলঙ্কা ছাড়ার কড়া নোটিশ দেন। চীনা ডুবো জাহাজকে কলম্বোর বন্দর ব্যবহার করার অধিকার প্রত্যাহার করে নেন। চীন শ্রীলঙ্কা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে পালায়। ভারত মহাসাগরের কর্তৃত্ব ফিরে পায় ভারত।

নেপালে সম্প্রতি সার্কভুক্ত দেশগুলির সম্মেলন হয়ে গেল। এই সম্মেলনে চীনকে সার্ক-এর সদস্য করার জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ নির্লজ্জভাবে দালালি করেন। শোনা যায় যে চীন সার্ক-এর সদস্যপদ পেতে প্রচুর ঘুষ দিয়েছিল। সম্ভবত সেই কারণেই পাক প্রধানমন্ত্রী গোঁ ধরেছিলেন যে সার্কভুক্ত দেশগুলির মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ সহযোগিতার ভারতীয় প্রস্তাবে তিনি স্বাক্ষর করবেন না। সার্ক-সম্মেলনে পাকিস্তান বাদে অন্য সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রই চীনকে সদস্যপদ দিতে আপত্তি জানায়। ফলে পাকিস্তান একঘরে হয়ে যায়। সম্মেলনের শেষদিনে পাক প্রধানমন্ত্রী বাধ্য হন বিদ্যুৎ বণ্টন সহযোগিতার ভারতীয় প্রস্তাবে স্বাক্ষর করতে। এই দুটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে মোদী সরকারের বাস্তব বিদেশ নীতির কাছে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র চীন নতজানু হতে বাধ্য হয়েছে। মনমোহন জমানায় দুর্বল বিদেশ নীতির জন্য চীন ভারত মহাসাগর থেকে অরুণাচল-লাদাখ এলাকায় অনুপ্রবেশ করে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। এটাই পালাবদল।

কালো টাকা উদ্ধারে মোদী সরকার কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে। বাজেট অধিবেশনের শেষদিনে কালো টাকা রুখতে বিল পেশ করা হয়েছে। বিলে বলা হয়েছে, বিদেশে লুকানো সম্পত্তি এবং আয়ের উপর শাস্তি হিসেবে আয় বা সম্পত্তির মূল্যের ৯০ শতাংশ জরিমানা দিতে হবে। বিদেশে রাখা অর্থ এবং সম্পত্তির রিটার্ন ইচ্ছাকৃতভাবে দাখিল না করলে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা সহ ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সংসদে পেশ করা বিলে। মনমোহন জমানায় কালো টাকার কারবারিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য কোনো চেষ্টাও করা হয়নি। এখানেই মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর পার্থক্য। দেশের অধিকাংশ বিরোধী দলই একজোট কেন্দ্রীয় জমি বিলের বিরোধিতা করছে। কিন্তু তারা উপযুক্ত বিকল্প প্রস্তাব দিচ্ছে না। জমি ছাড়া শিল্প কারখানা গড়া সম্ভব নয়। তাই বিরোধী দলের নেতাদের বিকল্প জমি নীতি সংসদে রাখতে হবে। কৃষির সঙ্গে শিল্পের উন্নয়ন হবে কীভাবে বলতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রচার করে কৃষকদের বিভ্রান্ত করছে বিরোধীরা।

বেশ করেছি ছবি বেচেছি, বেচবই তো...

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা

জমে উঠেছে ভোটের বাজার। শহরে শহরে লাল, নীল, সবুজের মেলা বসেছে। ঠিক দিদি, আপনার ক্যানভাসের মতো। অনেকেই বলে আপনার ছবির নাকি কোনো মানেই হয় না। সব ভুলভাল। ওই ছবির নাকি কোনো সোজা উল্টো নেই। যে কোনো একটা দিক ওপরে করে ঝুলিয়ে দিলেই হলো। আমি অবশ্য ছবির মাধামুণ্ডু কিছুই বুঝি না। তবে এটুকু বুঝি দিদি যখন এঁকেছেন তখন তাঁর অনেক দাম। অনেক অনেক কোটি টাকা।

দিদি বলছিলাম না, ভোটের বাজার আপনার ক্যানভাসের মতোই রঙিন। আবার ভোটের প্রচারও দেখছি সেই আপনার ছবির রঙেই রঙিন। কথায় কথায় উঠছে ছবির প্রসঙ্গ। দাম প্রসঙ্গ। আর তা আপনিও জমিয়ে দিয়েছেন। বেশ করেছেন জমিয়ে দিয়েছেন। সব হিসেব গোলমাল হয়ে গেছে। প্রথমত যে ছবি সব দিকই সোজা হতে পারে আবার উল্টো হতে পারে, তার দাম কি আর মুখ্য সংবাদমাধ্যম করতে পারে! তাই তো নানা সমালোচনা করছে। আপনি তিনবার তিন রকম হিসেব দিয়েছেন। বেশ করেছেন। আপনার ছবি, আপনার রাজ্য, আপনার টাকা, আপনার হিসেব আপনি যখন যেমন খুশি তেমন দেবেন। কার কী বলার আছে! এর সঙ্গে কেন্দ্রটাও আপনার হলে তো কথাই ছিল না। সুদীপ্ত সেনটা আর কটাদিন টাকা তুলতে পারলে সেটাও হয়ে যেত। পয়সায় কী না হয়! ডেলোর মিটিংয়ে তো শুনেছি আপনাকে সর্বভারতীয় নেত্রী বানিয়ে রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতায় আমার শপথ নিয়েছিলেন মহাত্মা সুদীপ্ত সেন। যাক সে কথা।

কিন্তু দিদি, দুধ কলা দিয়ে পোষা কালসাপই যে এখন বিষ ঝাড়ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি যার কথা ভাবছেন তার কথাই বলছি। আপনার দয়ায় সাংসদ, কেন্দ্র মন্ত্রী ছেলে বিধায়ক আর আজ কিনা আপনাকে ফাঁসাতে সব ফাঁস করে দিচ্ছে!

সারদা কেলেঙ্কারিতে 'ত্রিনেত্র কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেড' নামে একটা সংস্থার নাম উঠে এসেছে। সেই সংস্থার রহস্যময় ভূমিকার তদন্ত করতে গিয়ে উঠে এসেছে 'ত্রিলোক অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড' নামে আর এক সংস্থার নাম। জানা যাচ্ছে 'ত্রিনেত্র' শুরুর সময় যিনি অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন, সেই মনোতোষ যাদব 'ত্রিলোক'-এরও ডিরেক্টর। সংস্থাটি ২০১১ ও ২০১২ সালে মোট সাড়ে পাঁচকোটি টাকার ছবি কিনেছে। সেই ছবি কার আঁকা জানা না-থাকলেও যে হেতু সারদা কেলেঙ্কারিতে বারবার ছবির প্রসঙ্গ উঠে আসছে, তাই এ ব্যাপারে খোঁজখবর শুরু করেছেন ইডি-র গোয়েন্দারা আর তাতেই সন্দেহ আপনার ছবিই কিনেছে ওরা। লোকে বিশ্বাসও করছে। আর সাক্ষ্য প্রমাণও নাকি জোগাড় হয়ে গেছে। একেই বলে কুৎসা আর চক্রান্ত।

এদিকে 'ত্রিলোক' বা 'ত্রিনেত্র' কারও ঠিকানাতেই অফিসের খোঁজ মিলছে না। লিলুয়ায় মনোতোষ যাদবের বাড়ি গিয়েও তার খোঁজ মেলেনি। অনেকে বলছে তাকে নাকি ভ্যানিস করে দেওয়া হয়েছে। 'ত্রিলোক'-এর অডিটরেরও খোঁজ মিলছে না। 'ত্রিনেত্র'-র অডিট রিপোর্ট নিয়ে এ প্রশ্ন উঠেছে। প্রথমত, এক-এক বছরে একই অডিটরের সই এক-এক রকম। এর ওপর অডিটর হিসেবে যাঁর নাম আছে, সেই রবিকুমার ভট্টর অভিযোগ তাঁর সই রবার স্ট্যাম্প জাল করা হয়েছে। 'ত্রিনেত্র'-র দুই ডিরেক্টর মনোজকুমার শর্মা ও শশীকান্ত দাসও বেপাত্তা। রহস্য আর রহস্য।

হিসেব বলছে, ২০১০-'১১ আর্থিক বছরে 'ত্রিলোক' ৫০ লক্ষ টাকায় দু'টি ছবি কিনেছিল। এর পরের বছর পাঁচটি ছবি কিনতে তারা খরচ করে পাঁচ কোটি টাকা। অথচ, ডিরেক্টরদের রিপোর্ট বলছে ওই বছরে সংস্থার আয় শূন্য এবং ক্ষতির পরিমাণ ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭৬৭ টাকা। লোকসানে চলা একটা সংস্থা এত টাকায় কার, কোন ছবি কিনল? 'ত্রিলোক'-এর অডিটর সংস্থা 'সুলতানিয়া উমেশ অ্যান্ড কোম্পানি'রও কোনো খোঁজ নেই।

তৃণমূলের হিসেবে ছবি বিক্রি করে সাড়ে ছয় কোটি টাকা আয়ের কথা বলা হয়েছে। 'ত্রিলোক'-এর হিসেব বলছে, ছবি কেনা খাতে তাদের খরচ সাড়ে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা।

সব মিলিয়ে তৃণমূল, ত্রিনেত্র, ত্রিলোক তিনে মিলে রহস্য ঘনীভূত। সত্যজিৎ রায় বেঁচে থাকলে ফেলুদাকে পাঠাতেন। টিনটোরেটোর যিশুর মতো আবার ছবি নিয়ে গল্প হোত। জটায়ু বলতেন, কালীঘাটে কেলেঙ্কারি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নতুন কাঁটা সিরিজ লিখতেন— ঘাসফুলের কাঁটা, আর ব্যোমকেশ তো নতুন করে লিখতেন— চিত্রচোর।

—**সুন্দর মৌলিক**

পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় ও সরোজিনী নাইডু

একটি ঐতিহাসিক বিতর্ক

ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বস্তিকা পত্রিকায় কিছুদিন আগে সরোজিনী নাইডু সম্পর্কে একটি লেখা বেরোয়। এর প্রত্যুত্তরে সরোজিনী নাইডুর বিচ্যুতি তুলে ধরে একটি পত্রও প্রকাশিত হয়। কিন্তু মূল লেখাটিতে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী চয়ন করা হয়েছে, কোনো বিচার বিশ্লেষণ ছিল না। আর পত্রকার সরোজিনী নাইডুর ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরেছেন, বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তা গ্রথিত হয়নি। আমি আলোচ্য লেখায় একটি ঐতিহাসিক বিতর্ক তুলে ধরছি, যা সাম্প্রতিক ভারতীয় রাজনীতির পক্ষেও তাৎপর্যপূর্ণ।

লালা লাজপত রায়

সরোজিনী নাইডু

প্রথমে দু'জন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে দু'চার কথা বলে বিতর্কটি আলোচনা করব। এবছর লালা লাজপত রায়ের জন্মের সার্ধশতবর্ষ। জাতীয় স্তরেও এই মহান নেতা নিয়ে কোনো কর্মসূচি দেখছি না। ১৯৬৫ সালে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছিল। সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। লালবাহাদুর নিছক কংগ্রেস দলের নেতা ছিলেন না, তিনি লাজপত রায় প্রতিষ্ঠিত 'Servants of people Society'-র সক্রিয় কর্মীও ছিলেন এবং পরে সভাপতি হন। লালা লাজপত রায় ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য ব্যতিক্রমী চরিত্র। বিশ শতকের শুরুতে 'লাল-বাল-পাল' ত্রিমূর্তির অন্যতম নেতা লালাজী জাতীয় আন্দোলনে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁর মান্দালয়ে নির্বাসন (১৯০৭) সমগ্র দেশকে নাড়া দিয়েছিল। আবার তাঁর প্রয়াণ হয় ১৯২৮ সালের ১৭ নভেম্বর। লাহোরে সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হন এবং তার ফলেই তাঁর প্রয়াণ ঘটে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে পাঞ্জাবের তরুণ বিপ্লবীরা ভগৎ সিংহের নেতৃত্বে দুর্জয় বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু লালা লাজপত রায় নিছক বিপ্লববাদের প্রাণপুরুষ ছিলেন না, একই সঙ্গে গণআন্দোলনের মূল স্রোতে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। তাই ১৯২০ সালে তাঁর সভাপতিত্বে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়। আবার ওই বছরেই (অক্টোবর) বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

লালাজীর অন্য একটি অবদান হলো সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের সমন্বয় সাধন। প্রথমে আর্য সমাজ, তারপর সারভেন্টস অব পিপল সোসাইটি এবং পরিশেষে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতিরূপে ভারতের ধর্ম ও সমাজ জীবনকে কলুষমুক্ত ও প্রাণবন্ত করতে চেয়েছিলেন। এর উদ্দেশ্য হলো সমাজে বিভাজন ও দুর্বলতা থাকলে জাতীয় আন্দোলন প্রাণবন্ত হতে পারে না।

দূরদর্শী লালাজী দেখলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মূল শত্রু হলেও ভারতে ধর্মীয় বিদ্বেষ, বিশেষত মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভেদমূলক রাজনীতি, আর হিন্দুদের মধ্যে উদাসীন আপোশমুখী নিরাসক্ত মনোভাব সক্রিয় গণআন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই জন্যই লাজপত রায় জাতীয় কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা হওয়া সত্ত্বেও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। দ্বৈত সংগ্রামের মহান যোদ্ধা লাজপত রায় সমাজের ক্ষত নিবারণ করার পাশাপাশি সক্রিয় গণআন্দোলনের সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এখন প্রশ্ন হলো, লালাজীর সঙ্গে ভারতের প্রবাদপ্রতিম মহিলানেত্রী সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) কীভাবে বির্তকে জড়ালেন? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯২০-১৯২২ সালে ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলমান যৌথ গণআন্দোলন শুরু হয়। অচিরে পরিস্থিতির অবনতি ঘটল। সুদূর দক্ষিণে মালাবারে মোপলা সম্প্রদায় হিন্দু নিধন শুরু করে। শ্রদ্ধেয় নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (১৮৫৬-১৯২৬) মুসলমানের হাতে নিহত হন। ইতিপূর্বে ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাটে

মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় ১৫৫ জন হিন্দুর মৃত্যু হয় এবং কোহাট এলাকায় সমস্ত হিন্দু বাস্তুভিটা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক গান্ধীজী কোহাট নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি হননি, কারণ তাঁর আশঙ্কা হিন্দুদের উপর নির্যাতন হলেও বিষয়টি ধামাচাপা দিলে ভাল হয়। মহাদেব দেশাই-এর ডায়েরি (Day to Day with Gandhiji) থেকে জানা যায় গান্ধীজী শত নির্যাতন সত্ত্বেও হিন্দুদের শান্ত থাকার নির্দেশ দেন এবং প্রয়োজনে তারা যেন মৃত্যুবরণ করে ("I must ask the Hindus even to day to die and not to kill") উপদেশ দেন। স্বভাবতই লাজপত রায় গান্ধীজীর হিমশীতল মনোভাবে রুষ্ট হয়েছিলেন। গান্ধীজী মৌলানা মহম্মদ আলি ও সওকত আলির প্রভাবে এতটা আচ্ছন্ন ছিলেন যে তিনি হিন্দুদের বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ ও অত্যাচার নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি।

এই পরিস্থিতিতেই হিন্দুদের স্বার্থ ও সংহতি রক্ষার জন্য হিন্দু মহাসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হন। ১৯২৫ সালের এপ্রিলে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার অষ্টম সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে লাজপত রায় ভগবত গীতার সক্রিয় প্রতিরোধ নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন ("we cannot afford to be so weak and imbecite as to allow or encourage others to crush us")। দুর্বলতা ও কাপুরুষতা মুক্তির পথ নয়, আত্মহননের পথ।

এই রকম পরিস্থিতিতে ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে কানপুরে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সরোজিনী নাইডু সভাপতি পদে মনোনীত হলেন। লাজপত রায় চেয়েছিলেন অন্য কেউ কংগ্রেস সভাপতি হোক, কারণ সংকটময় পরিস্থিতিতে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রয়োজন। কিন্তু গান্ধীজী সরোজিনী নাইডুকে সভাপতি করতে চাইলেন, তাঁর আশা ছিল সরোজিনী নাইডুকে তিনি নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। অন্য কেউ কংগ্রেস সভাপতি হলে কংগ্রেসে গান্ধীজীর নিয়ন্ত্রণ খর্ব হতে পারে।

এদিকে সরোজিনী নাইডু পাঞ্জাবে এসে হিন্দু রাজনীতিবিদদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিতে বললেন এবং লাল লাজপত রায়কে জাতিগোষ্ঠীর রাজনীতি ছেড়ে সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ রাজনীতির দিকে মনোনিবেশ করতে বললেন। এর উত্তরে লালা লাজপত রায় লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকায় (২২ অক্টোবর ১৯২৫) এক দীর্ঘ পত্রে জানালেন যে, হিন্দুরা জাতপাত, ধর্ম ও গোষ্ঠীর ভিত্তিতে নয়, সমগ্র ভারতের সর্বস্তরের মানুষের জন্য স্বরাজ চায়। তাঁর বক্তব্য হলো শ্রীমতী নাইডু বুঝতে পারছেন না যে হিন্দুদের অভ্যন্তরীণ শক্তি, সংহতি ও সামাজিক সংস্কারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। বোম্বাই ক্রনিক্যাল সংবাদপত্রে প্রকাশিত লেখা From Ravi to Brahma Putra (মে, ১৯২৫) স্বামী বিবেকানন্দের মতোই লাজপত রায় হিন্দু জীবনে ভয়ভীতির অভিশাপ তুলে ধরেছেন (Hindu life is fear of friend, fear of foe, fear of goods above and gods below, fear of losing castes)। এই ভীতি ও দাসসুলভ মনোভাব থাকলে কোনোদিন প্রকৃত স্বরাজ আসবে না। তাঁর অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী হলো সংগ্রামী মনোভাব না থাকলে স্বরাজ পেলেও তা রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায় "A community which cannot fight its own battles and cannot protect itsell form the aggressive attitude of others will never be fit either for winning Swarajya and for keeping it when won"।

লালাজীর শোচনীয় প্রয়াণের ১৯ বছরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হলো। কিন্তু লালাজীর স্বপ্নের ভারতের আদর্শ পূরণ হয়নি। আপোশের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীন হলো আর মুসলমান দ্বি-জাতিতত্ত্বের কাছে নতি স্বীকার করতে হলো। আর অন্যদিকে সরোজিনী নাইডু ছিলেন কবি, অনুভূতি প্রবণ ও বাপুর স্নেহধন্যা অনুগামী। তাই স্বাধীনতার পরেই আন্দোলনের রাজনীতির পাট চুকিয়ে তিনি বসলেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপালের মসনদে। সংগ্রামের প্রতীক লালা লাজপত রায় রাস্তায় লাঠিচার্জের আঘাতে প্রাণ দিলেন আর নেতাজী সুভাষ আজাদ হিন্দবাহিনী নিয়ে করে দুর্গম পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়ালেন। দিল্লী চলোর সংগ্রাম অপূর্ণ রইল আর আপোশের মাধ্যমে দিল্লীতে ক্ষমতাসীন হলেন বাপুর প্রিয় কংগ্রেস অনুগামীবৃন্দ।

লালাজীর শোচনীয় প্রয়াণের ১৯ বছরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হলো। কিন্তু লালাজীর স্বপ্নের ভারতের আদর্শ পূরণ হয়নি। আপোশের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীন হলো আর মুসলমান দ্বি-জাতিতত্ত্বের কাছে নতি স্বীকার করতে হলো। আর অন্যদিকে সরোজিনী নাইডু ছিলেন কবি, অনুভূতি প্রবণ ও বাপুর স্নেহধন্যা অনুগামী। তাই স্বাধীনতার পরেই আন্দোলনের রাজনীতির পাট চুকিয়ে তিনি বসলেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপালের মসনদে।

তথ্যসূত্র :

(১) বি. আর. নন্দ সম্পাদিত— The Collected worus of Lala Lajpat Rai (একাদশ খণ্ড)।

(২) ভি. গ্রোভার সম্পাদিত --- Political Thinkers of India (পঞ্চদশ খণ্ড)।

পশ্চিমবঙ্গে পৌর পরিষেবার হাল হকিকত

দেবব্রত ঘোষ

ভোট আসে ভোট চলেও যায়। কোনো দল-ই কথা রাখে না। মফস্‌সল বা গ্রামগুলো এক জায়গাতেই পড়ে থাকে। বাম শাসনকালে ঠিক যেমনটা থাকতো তৃণমূল জমানাতেও অবিকল একই রকম রয়ে গেছে জায়গাগুলো। কলকাতা শহর সংলগ্ন অভিজাত ও উচ্চবিত্ত এলাকাগুলোকে বাদ দিলে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা দুটো জেলারই পৌর পরিষেবার হাল বেশ করুণ। হাওড়া, হুগলী, দুই মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়া ও বর্ধমান জেলার সামগ্রিক পৌর পরিষেবার হালও তথৈবচ। বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া-সহ উত্তরবাংলার পৌর পরিষেবার হাল তো আরও করুণ। মিডিয়ার দৌলতে আমরা আজকাল অনেকটা খবর পেয়ে থাকলেও প্রত্যন্ত গ্রামগুলো, যেগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত নয়তো পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত, সেগুলোর সঠিক তথ্য আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় না। নাগরিক পরিষেবা বলতে সড়ক যোগাযোগ, সুলভ যাতায়াত ব্যবস্থার মাধ্যম, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর পরিকাঠামো— এই পাঁচটাই মুখ্য।

সড়ক যোগাযোগ : গত কয়েকটা বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় খুব বেশি হলে মাত্র ৩ শতাংশ রাস্তা তৈরি হয়েছে এবং সেগুলোও অপরিকল্পিতভাবে। আমাদের রাজ্যের সব জেলারই সামগ্রিক সড়ক ব্যবস্থার হাল যথেষ্ট খারাপ। কলকাতা শহর কর্পোরেশন এলাকা ছাড়িয়ে কয়েক কিলোমিটার এগিয়ে যে কোনো প্রধান সড়ক থেকে গলিপথে ঢুকলেই একই চিত্র। রাস্তা অপ্রশস্ত, যেখানে রাস্তা খানিকটা প্রশস্ত সেগুলো অস্থায়ী ব্যবসায়ীরা দখল করে রাখায় সেগুলো মানুষের চলাচলের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধেজনক। যেখানে পাকা সড়ক রয়েছে সেগুলোর মেরামত বা সংস্কার হয় না, ভোটের আগে যদিও বা খানিকটা হয় সেখানে সিমেন্ট, বালি, খোয়া বা ভাঙা ইটের টুকরো, স্টোনচিপ, আলকাতরা বা পিচ যতটা দেওয়া উচিত তার এক তৃতীয়াংশ ব্যবহার করা হয় যার ফলে ঠিকাদারের বা কাঁচামাল সরবরাহকারী গোষ্ঠীর লোকদের এবং অতি অবশ্যই শাসকদলের স্থানীয় নেতাদের পকেট ভারি হয়, কিন্তু পৌরকর প্রদানকারীদের তাতে কোনো লাভই হয় না। রাস্তাগুলোর হাল একটা বছর যেতে না যেতেই আগেকার অবস্থায় ফিরে যায়। এবড়োখেবড়ো, খানাখন্দে ভরা সড়কপথে মানুষ হোঁচট খায়, হাত-পা ভাঙে, অটো বা রিক্সা অ্যাক্সিডেন্ট এখন সব লোকের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কাঁচা সড়কগুলোকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহু বছর ধরে পাকা সড়কে পরিণত করা হয়নি।

পানীয় জলের দাবিতে পুরুলিয়া জেলায় বিক্ষোভ।

যেসব মফস্‌সল শহর বা একটু বড়ো গ্রাম কোনো রেলস্টেশনের পাশে বা সামান্য দূরে অবস্থিত সেক্ষেত্রে দেখা যায় স্টেশন এলাকা ছাড়ালেই সড়ক পথের বেহাল অবস্থা। হাওড়া জেলার মৌড়িগ্রাম-আন্দুল ছাড়ালে, হুগলী জেলার রিষড়া বা হরিপাল ছাড়ালে, দক্ষিণ ২৪ জেলার সুভাষগ্রাম-মল্লিকপুর ছাড়ালে, উত্তর ২৪-পরগনা জেলার বিরাটি- আগরপাড়া-নিউ ব্যারাকপুর ছাড়ালে, নদীয়ার বেথুয়াডহরী-নবদ্বীপ ছাড়ালে একই চিত্র চোখে পড়ে। বোলপুর স্টেশন দেখে যেমন বীরভূম জেলার সড়ক ব্যবস্থার হাল বোঝা যাবে না তেমনি বহরমপুর স্টেশন দেখে মুর্শিদাবাদ জেলার সড়ক ব্যবস্থার হাল বোঝা যাবে না। অতি সম্প্রতি আমি নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলা ঘুরে এলাম। প্রধান সড়ক পথ বাদ দিলে বাদবাকি এলাকাগুলোতে সড়ক পথ বলে কিছু নেই কিংবা থাকলেও ভয়ঙ্কর বাজে অবস্থা রাস্তাগুলোর। বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলার প্রান্তিক এলাকায় ঘোরার সুযোগও আমার হয়েছে। আজকের যুগেও রাস্তাঘাটের অবস্থা যে এতোটা বেহাল হতে পারে স্বচক্ষে না

দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। হাওড়া হুগলী, নদীয়া, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন এলাকায় আমার নিত্য যাতায়াতের সুবাদে দেখেছি বেহাল সড়ক এবং ততোধিক বাজে যানবাহন পরিষেবা।

বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহ : বিভিন্ন জেলার বিশেষ করে বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় পানীয় জলের সঙ্কট আজকের নয়, বহু কালের। দুই ২৪ পরগনার জলে যদি আর্সেনিকের আধিক্য হয়ে থাকে প্রধান সমস্যা, তবে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে জল সমস্যা আরো গভীরে। গ্রীষ্মকালে জলাভাব সেখানে নিত্য সমস্যা। স্থানীয় প্রশাসন এটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি, রাজ্যের বিভাগীয় মন্ত্রী বা তাদের দপ্তর সমানভাবে নির্বিকার। অতএব পানীয় জলের সমস্যা ও সঙ্কট ওই জেলাগুলোতেও রয়েছে, বিশেষ করে গরমের সময়ে। গভীর নলকূপ নির্মাণ করে বা জলাশয়গুলোকে সংস্কার করে সঙ্কট কিছুটা মেটানো যেতো কিন্তু করা হয়নি। কলকাতা থেকে দূরে অবস্থিত আঞ্চলিক পৌরসভাগুলো সমস্যাটাকে তেমন কোনো গুরুত্ব দেয় না।

জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা : এই ব্যাপারে রাজধানী শহর কলকাতা আর রাজ্যের জেলাগুলোর হাল একই রকম। কোনো কোনো জায়গায় তো মাত্র আধঘণ্টা বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল জমে যায় এবং সেই জমা জল সরতে আরো একঘণ্টা। বর্ষাকালে বহু এলাকায় এমনকী অভিজাত এলাকাতেও দিনের পর দিন প্রধান রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে থাকে, গলিপথগুলোর অবস্থা নরককুণ্ডের মতো। এই ব্যাপারে বেহালা, ডালহৌসী, ক্যানিং স্ট্রিট, শিয়ালদহও যা, বিরাটি, নিউ ব্যারাকপুর, বেলঘরিয়া, সোদপুর (উত্তর ২৪ পরগনাতে), লস্করপুর, সোনারপুর, বারুইপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে), কোন্নগর, রিষড়া, হিন্দমোটর (হুগলীতে), সাঁতরাগাছি, মৌড়ীগ্রাম, ডোমজুড় (হাওড়াতে) যে ছবি আমরা বর্ষাকালে নিত্য দেখি, আরো করুণ চিত্র আমরা দেখি নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর (পূর্ব) জেলার প্রান্তিক গ্রামগুলিতে। উত্তরবাংলার জেলাগুলো তো বর্ষাকালে অগম্য হয়ে ওঠে যার শতকরা ৮০ শতাংশ কারণ জল নিষ্কাশনের উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকা। এই দায় রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরের ওপর যেমন বর্তায় তেমনি এলাকার পৌরসভাগুলোর ওপরে সমভাবে বর্তায়। যেখানে সেখানে, পৌর আইনের তোয়াক্কা না করে বহুতল বাড়ি তৈরি করে বাসস্থানের সমস্যা কিছুটা দূর করা গেলেও ভিন্ন ও গভীরতর সমস্যা তৈরি হয়েছে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় এবং যত্রতত্র আবর্জনা জমে থাকায়। জেলাগুলিতে যেসব পৌরসভা রয়েছে (কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েত) তাদের অধিকাংশই গোষ্ঠীতন্ত্র ও দলতন্ত্রকে একমাত্র আরাধ্য দেবতা করতে গিয়ে জনগণের সমস্যার দিকে ফিরে তাকায়নি, সঙ্কটের কোনো মোকাবিলা করেনি, কীভাবে জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা যায় সে ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করেনি। পৌরদপ্তরের সঙ্গে রাজ্যের পূর্তদপ্তর, সেচবিভাগ বা যোগাযোগ বিভাগের কোনো সমন্বয় নেই এবং সেই সমন্বয়হীনতা যে খাতে যে অর্থ আদায় কিংবা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই অর্থ অন্যান্য কাজে বা অকাজ-কুকাজে অপব্যয় করে করদাতা জনগণকে প্রতারিত করে নিজেদের পকেট ভরানো হয়েছে এটা দিনের আলোর মতো অতি বাস্তব সত্য এবং এই একটা ব্যাপারে কংগ্রেস-বাম-তৃণমূল একই আসনে অবস্থিত।

বৃষ্টির জলে কোচবিহার শহরের পথ নদীর রূপ নিয়েছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র : একে তো রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি কম, তার ওপর আবার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অধিকাংশের অবস্থাই অতি শোচনীয়। কর্মচারীদের ব্যবহার অমানবিক। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হয় চিকিৎসক নেই, চিকিৎসক থাকলে স্বাস্থ্যকর্মী নেই, দুজনেই থাকলে প্রয়োজনীয় ওষুধ নেই কিংবা Expiry date পেরিয়ে যাওয়া বাতিল ওষুধ রয়েছে, কোনো প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন থাকে না, সাপে কাটা চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, অ্যাম্বুলেন্স থাকলেও দরকারে পাওয়া যায় না, দূরের গ্রাম থেকে রোগীকে অর্ধমৃত অবস্থায় ভ্যানে করে যাওয়া-আসা করতে গিয়ে চিকিৎসার সময় পেরিয়ে যায়। দামি ওষুধ অনেক ক্ষেত্রেই বাইরে খোলা বাজারে বিক্রি হয়ে যায়— সৌজন্যে ডাক্তারবাবুর সহকারী বা চতুর্থ শ্রেণীর স্বাস্থ্যকর্মচারীর দল ও তাদের বিপুল

পরাক্রমী ইউনিয়ন। মানছি, এটা রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের দায় কিন্তু এলাকার পৌরসভা (বা পঞ্চায়েতগুলো) সমভাবে দায়ভাগী, কারণ তারা শাসকদল নিয়ন্ত্রিত এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির কর্মচারীরাও ভয়ে বা ভক্তিতে শাসকদল নিয়ন্ত্রিত। পৌরসভা পরিচালিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিরও একই হাল। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরল, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এমনকী ত্রিপুরার চেয়েও আমাদের রাজ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবার ব্যাপারে পিছিয়ে।

পেশীশক্তির রমরমা : পৌর পরিষেবার এই শোচনীয় হালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পেশীশক্তি। পশ্চিমবাংলার সাম্প্রতিক পৌর নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ বৈজ্ঞানিক সন্ত্রাসের নতুন চেহারা দেখল যেখানে সংখ্যালঘু তোষণকারী তৃণমূল কংগ্রেসের গুণ্ডাবাহিনী, মেরুদণ্ডহীন পুলিশ প্রশাসনের একাংশ এবং রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের মাথায় বসে থাকা তৃণমূলের মদতপুষ্ট নির্বাচনী আধিকারিকের ত্রিমুখী আক্রমণে বিরোধী পক্ষ ছন্নছাড়া। আরামবাগ, তারকেশ্বর এবং গয়েশপুর এই তিন পুরসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যের বর্তমান শাসকদল তৃণমূল দখল করে নিয়েছে এবং কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি-সহ সব বিরোধী দলই বহু আসনে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। কারণ ওই সব আসনে বিরোধী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে বিরোধী প্রার্থীদের স্ত্রী, কন্যা বা বোনেরা ধর্ষিতা হোত কিংবা প্রার্থীদের শিশুসন্তানেরা বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যেত। স্বৈরাচারের এই হিংস্র কদর্য চেহারা আমরা আগে কিছুটা দেখে থাকলেও, এতোটা ব্যাপক আকারে দেখিনি।

পৌরপরিষেবার চালচিত্র : নামখানা থেকে রসিকবিল, ক্যানিং থেকে ঝাড়গ্রাম, হলদিয়া থেকে লাভপুর, সিঙ্গুর থেকে আজিমগঞ্জ, বনগাঁ থেকে রানাঘাট, আমতা থেকে নলহাটি— সর্বত্র পৌর পরিষেবার এক ছবি। কোথাও কালোর শেড একটু বেশি কোথাও বা একটু কম। পৌরসভাগুলি কর আদায়ে যতোখানি তৎপর, পরিষেবা দিতে ঠিক ততোটাই অপারগ ও অনিচ্ছুক। ঘুষ বা উৎকোচের বিনিময়ে পাইয়ে দিতে, বেআইনি বিল্ডিং প্ল্যানকে অনুমোদন দিয়ে দিতে এবং অননুমোদিত নির্মাণ (বহুতল বাড়ি থেকে দোকানঘর) গুলোকে সেফটি কমপ্লিশান সার্টিফিকেট দিতে তারা অতি তৎপর— এই কখনো তৎপরতাহীনতা এবং কখনো অতি তৎপরতা বাম জমানায় ছিল এবং চলমান তৃণমূল জমানাতেও থেকে গেছে একইভাবে, সংখ্যাগত ও গুণগত উভয়ভাবেই। এই প্রাবন্ধিক নিজে তো বটেই, আরো অনেকেই ভুক্তভোগী বিভিন্ন পৌরসভার ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি এবং বিভিন্ন পৌরবিভাগের কর্মীর ব্যবহার ও কথাবার্তায় অপরিসীম ঔদ্ধত্য কীভাবে সাধারণ নাগরিক ও করদাতাকে বিপন্ন করে। এই দূষণ শাসনতন্ত্রের তো বটেই তবে তার চাইতে বড় কথা আমাদের বাংলা ও বাঙালির দীর্ঘলালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কোথায় টেনে নামিয়েছে এই দলতান্ত্রিক পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলো! প্রথম ২০ বছরে কংগ্রেস যা করেছে, পরের ৩৪ বছরে বামফ্রন্ট তার কয়েকগুণ বেশি অপকর্ম করেছে এবং পরের ৪ বছরে তৃণমূল অধিকতর দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে অবক্ষয় ও অধোগামিতার দিকে। রাজ্যে গণতন্ত্র নেই, আছে সর্বগ্রাসী দলতন্ত্র এবং বিজেপি-র মতো জাতীয়তাবাদী দল এখনো এই রাজ্যে সেভাবে প্রভাব বাড়তে না পারায় সিপিএমের আদর্শ মেনে তৃণমূলীরা পৌরসভা গঠন করবে। যদি কোনো কোনো পৌরসভায় বিকল্প শক্তি হিসেবে জাতীয়তাবাদী শক্তি উঠে আসে তখনই তা পশ্চিমবাংলার উন্নয়নে সঠিক দিশা দেখাতে পারবে।

বেহাল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

পৌর সভাগুলির নির্বাচন—যাত্রা শুরুর আহ্বান

দেবব্রত চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গে ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে স্টেজ 'রিহার্সাল' হচ্ছে আসন্ন কলকাতা পৌরসভা ও পুরসভার নির্বাচন। এই ৯১টি পুরসভায় ওয়ার্ডের সংখ্যা প্রায় ১৮০০। অর্থাৎ ১৮০০ জন কাউন্সিলার কমিশনারের নির্বাচন। এই পুরসভাগুলির সিংহভাগ বর্তমানে শাসকদল টিএমসি-র দখলে। তাই কিছু বাড়তি সুবিধা এই দল প্রথম থেকেই পাবে। যদিও স্থানীয় অধিবাসীদের পৌরসভার পরিচালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রচুর। অভিযোগগুলি মূলত জল সমস্যা, নিকাশী ব্যবস্থা, ভাঙাচোরা রাস্তা, ঠিকমতো নর্দমা পরিষ্কার না করা। ফলে মশার জন্ম ও অধিবাসীদের 'সোয়াইন ফ্লু'র আতঙ্ক। সর্বোপরি পুকুর বুজিয়ে প্রমোটরি রাজ কায়েম করা আর পাড়ায় পাড়ায় মদের ঠেক গড়ে উঠা। ফলে সন্ধ্যে হলে রাস্তায় মা-বোন ও ছাত্রীদের চলাফেলা প্রায় বন্ধ। খবরের কাগজ খুললেই এর সত্যতা সম্বন্ধে পরিচয় মিলছে। এত সমস্যার মধ্যেও জানাতে ইচ্ছে করছে কোন দল ক'টি ওয়ার্ড দখল করতে পারে। কারণ প্রতিদিন কাগজে দেখতে পাচ্ছি--- 'কাউন্সিলার' 'কমিশনার' হওয়ার জন্য 'মারামারি' 'রাস্তারোকো' প্রভৃতি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি। যার জন্য সাধারণ মানুষ নাজেহাল। বিশেষ করে টিএমসি ও বিজেপি দলের পক্ষে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এসব পৌরসভার অধিবাসীদের মধ্যে 'পরিবর্তন'-এর পরিবর্তনের চাহিদা তুঙ্গে। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে মূল বিরোধী দল হিসেবে জনগণ ভারতীয় জনতা পার্টিকেই বেছে নিয়েছে, রাজ্যে বিজেপি দলের কাছেই আশা বেশি, এই সব পৌরসভাগুলির ভোটারদের মধ্যে। কিন্তু বিজেপি দলকে এক প্রকট সমস্যার মধ্যে চলতে হচ্ছে। ভোটারদের ধর্ম বিন্যাসও এই নির্বাচনে একটা ফ্যাক্টর। পশ্চিমবঙ্গে এখন সংখ্যালঘু ভোটার প্রায় ৩০ শতাংশ। মূল কলকাতা শহরে বাঙালি মুসলমান বেশি থাকে না। তারা গ্রামে ও শহরতলিতেই বেশি থাকে। অর্থাৎ এই পৌরসভাগুলির প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। তারা মূলত শহরতলির জুটমিল, কাপড় মিল, ফাউন্ড্রি, রাজমিস্ত্রি, জহুরি, স্বর্ণকার, জরির কাজ করে। এমনকী কলকাতার নিউ টাউনের ফ্ল্যাট তৈরিতে নিযুক্ত শ্রমিকরাও এইসব পৌর

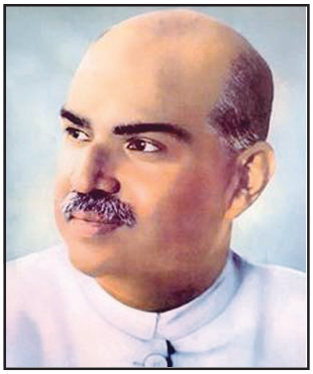

এলাকাতে থাকে কম খরচে জীবনযাত্রার জন্য। এই ৪০ শতাংশ ভোট এখন ভারতীয় জনতা পার্টি পাবে না। বাকি ৬০ শতাংশ ভোটের ভাগিদার ও দাবিদার এই ৪টি দল— বিজেপি, তৃণমূল, বামফ্রন্ট, কংগ্রেস এবং বিপুল সংখ্যায় নির্দল প্রার্থীরা। বিজেপি এই মুহূর্তে প্রায় ১৭ শতাংশ ভোটের অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গে যদি এই পৌরসভাগুলি দখল করতে হয় তবে ৬০ শতাংশ ভোটের কম করে ৩০ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশ ভোট দখল করতে হবে। যাকে এক কথায় বলা যায় 'পোলারাইজড্'। তা কি সম্ভব? ১.২৫ লক্ষ জনসমর্থক থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ সমর্থক হয়েছে বিজেপি-র। সম্প্রতি এই শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে যা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই স্বল্প সময়ে এইসব পৌরসভাগুলি কর্তৃত্ব দখল করা অলীক স্বপ্ন। তবে প্রায় পৌরসভাতেই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিনিধি থাকবে একথা হলপ করে বলা যায়। গত ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে একটা 'মোদী' সুনামি এসেছিল বিজেপি-কে ভারত শাসনের সিংহাসনে বসাতে। বাংলায়ও দরকার একটি 'মোদী' যার তুফানে বাংলার মসনদ আসবে বিজেপি-র দখলে, যে দলটি ভারতের স্বাধীনতার পর জনসঙ্ঘ নামে প্রতিষ্ঠিত করেছিল বাংলার বীর বাঙালি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই দলটি কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের নিজের পিতৃভূমিতে এখন সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 'এ যেন প্রদীপের নীচে অন্ধকার'। আশার কথা, বাঙালি তার ভুল বুঝতে শুরু করেছে। কিছু সময় লাগবে। এবার পৌরসভার নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি ১৮০০ সিটের মধ্যে হয়ত ১২০টির মতো আসন পেতে পারে যদি দলের অবস্থা আরও সঙ্গীন না হয়। তবে নিরাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বলা যায় মাত্র ১২ জন বিপ্লবী নিয়ে চে-গুয়েভেরা ও ফিদেল কাস্ত্রো কিউবা দখল করেছিলেন। ১৯৫২ সালে ভারতের প্রথম নির্বাচনে ড. শ্যামাপ্রসাদ মাত্র ৩ জন সংসদ নিয়ে পার্লামেন্টে জওহরলাল নেহরুর ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। ড. শ্যামাপ্রসাদকে বিরোধী নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির অবিসংবাদী নেতা এ. কে.গোপালন পর্যন্ত। তাই এবার পৌরসভার বেশি আসন না পেলেও 'যাত্রা শুরু'। এ যেন ভোরের আলো, প্রখর তাপযুক্ত সূর্য আমরা পাবো ২০১৬ সালে।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

পুরসভাগুলির নির্বাচন : ভবিষ্যতের রূপরেখা

অম্লানকুসুম ঘোষ

রাতের আকাশে পূর্ণচন্দ্রের পাশেই বিকশিত থাকে অসংখ্য তারকা। মহাসমুদ্রে সুউচ্চ তরঙ্গ চূর্ণ হওয়ার পরেই ধেয়ে আসে অসংখ্য ছোট্ট ঢেউ। তেমনই বর্তমান তমসাচ্ছন্ন বাংলার নির্বাচনী রাজনীতিতে কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনের পরেই হতে চলেছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মোট ৯১টি পুরসভার ভোট। কলকাতার লাগোয়া হাওড়া হুগলী ও দুই চব্বিশ পরগনাতে এর অধিকাংশ থাকলেও সুদূর মফস্সলেও কিছু কিছু পৌরসভায় ভোট হচ্ছে, যার মধ্যে আছে মালদা জেলার দুটি পৌরসভা এবং উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি সহ বিভিন্ন জেলার পৌরসভা। সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যাক এগুলির রাজনৈতিক চালচিত্র কি রকম।

পৌরসভা নির্বাচন মূলত হওয়া উচিত নাগরিক পরিষেবা বা স্থানীয় রাজনীতির ওপর ভিত্তি করে। যেমন পুরসভার পানীয় জল সরবরাহ, বর্জ্য পরিষ্কার, নিকাশি সংস্কার ইত্যাদি ব্যবস্থার উন্নতি কতটা হয়েছে বা কতটা দুর্নীতিহীনভাবে হয়েছে তার উপর। কিন্তু কার্যক্ষেত্র সামগ্রিক রাজ্য রাজনীতি বা কেন্দ্রীয় রাজনীতির ছোঁয়া বা প্রভাব ফেলে এই নাগরিক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার নির্বাচনেও। সে হিসেবে বলতে গেলে রাজ্যের বর্তমান শাসক দল এবং বেশিরভাগ পৌরসভার ক্ষমতাসীন বর্তমান শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের এখন বহু অভিযোগ। সারদা, রোজভ্যালী-সহ নানা দুর্নীতিতে তারা ঘোর বিপদে। তার ওপর মুখ্যমন্ত্রী-সহ মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্যের লাগামছাড়া আচরণে সরকার ও পুরসভাগুলি এখন ফের সঙ্কটে।

সাধারণ মানুষ (যারা নিরপেক্ষ, দলদাস নন) তৃণমূলের ওপর বীতশ্রদ্ধ, আবার প্রাক্তন শাসক দল সিপিএমের ওপরেও রাজ্যবাসী আদৌ প্রীত নয়, কারণ তাদের শাসনকালের অত্যাচারও সাধারণ মানুষ (দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হলেও) এখনও ভুলতে পারেনি। তাছাড়া সারদা-সহ নানা কেলেঙ্কারির কিছু কালিমা তাদেরও স্পর্শ করেছে। কংগ্রেস নামক সর্বভারতীয় দলটি সর্বভারতীয় স্তরেই তালা ঝোলাতে চলেছে, এ রাজ্যে তো তাদের অস্তিত্ব আণুবীক্ষণিক, বর্তমানে অদৃশ্যপ্রায়। অগত্যা সাধারণ মানুষ বিকল্প হিসেবে অগতির গতি বিজেপিকেই আঁকড়ে ধরেছে। তাই বিজেপি-র সামনে এ এক সুবর্ণ সুযোগ।

কিন্তু বিজেপি কি পারবে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে? মনে প্রত্যয় হওয়া বড়ই কঠিন। নরেন্দ্র মোদীর অমোঘ আকর্ষণ ও অন্য রাজনৈতিক দলগুলির দুর্নীতির ওপর তীব্র বিতৃষ্ণা তাদের সামনে যে অসীম সুযোগ এনে দিয়েছিল তাকে কাজে লাগাতে গেলে যে আত্মত্যাগ, লক্ষ্যে অবিচল থাকার সংকল্প, দুর্নীতিহীন থাকার মানসিকতা দরকার বর্তমান রাজ্য বিজেপি-র মধ্যে তার অভাব দেখা যাচ্ছে। ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষের চোখে যে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল 'A Party with Difference' সেই শ্রদ্ধার আসন আজ কিছুটা হলেও টলোমলো। তার ওপর প্রার্থী বাছাই নিয়ে রয়েছে সর্বস্তরে অসন্তোষ। দলের বাইরে থেকে প্রার্থী করা হয়েছে জনপ্রিয়তার কথা ভেবে, কিন্তু তাদের নির্বাচনও খুব একটা যুক্তিনিষ্ঠ বলে মনে হয় না।

যাই হোক, 'সব ভাল যার শেষ ভাল' পুরসভা নির্বাচন হবে ২৫ এপ্রিল অর্থাৎ কলকাতা পুরসভার এক সপ্তাহ পর। রাজ্য বিজেপি-র কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও মনে হয় রাজ্যের মানুষ মন্দের ভাল হিসেবে বেছে নেবেন বিজেপিকেও। কারণ অন্য দলগুলির সীমাহীন দুর্নীতি বিজেপি-র তুলনায় অনেক বেশি। আর ভোটের বাক্স যদি অন্য কথা বলে? তাহলে বুঝতে হবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের অধীনে হওয়া নির্বাচনকে তামাশায় পরিণত করেছে শাসক দলের ক্যাডারকুল। যার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে তিনটি পুরসভায় বিনা নির্বাচনে জয় হাসিল করার খবরে। তবে অত্যাচারের সেই পর্যায়ে গণতন্ত্রের জন্মভূমিতে গণতন্ত্রের দেবী কি থাকবেন চিরনিদ্রিতা? মনে হয় না। তখন রাজ্যবাসীকে বুঝতে হবে শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। ▮

Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

- Low Cost readymade Latrine (Toilet)
- Low Cost House
- Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
- Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES
"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street, Kolkata - 700 016
98311 85740, 98312 72657,Visit Our Website :
www.calcuttawaterproofing.com

চিঠিপত্র

ডাক বিভাগের দয়িত্ব

সূর্যদেব কোনোদিন ভাবেও না যে কাকে কাকে সূর্যের কিরণ দেওয়া হবে আর কাকে দেওয়া হবে না। এটা সূর্যদেবের বিচার্য বিষয় নয়। পৃথিবীর সকল প্রাণীকুলকে আলোকিত করাই প্রধান কাজ সূর্যদেবের।

ভারতীয় ডাক বিভাগের কর্তব্যও সূর্যের সমান গুরুত্বপূর্ণ। এতে কোনো ভেদাভেদ কাজ করবে না। ভারতীয় ডাক বিভাগের এই অপরিসীম গুরুদায়িত্ব পালন করাই কৃতিত্বের পরিচয়।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত বীরভূম জেলার দিঘল গ্রামের সম্প্রীতি সঙ্ঘে 'স্বস্তিকা' নামক ম্যাগাজিনটি প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে। সম্প্রীতি সঙ্ঘের বক্তব্য তারা স্বস্তিকা পাচ্ছে না। ডাকবিভাগে খোঁজ খবর নিতে গিয়ে দেখেন গত ১ মাসের 'স্বস্তিকা' পোস্ট অফিসে পড়ে আছে। পোস্টম্যানকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, স্বস্তিকাগুলি পড়ে আছে কেন? উত্তরে পোস্টম্যান বলেন— আপনারা স্বস্তিকা নামে একটি সাম্প্রদায়িক কাগজ পড়েন? সম্প্রীতি সঙ্ঘের কর্মকর্তারা বলেন— আমরা কোন কাগজ পড়বো না পড়বো এটা আপনি জিগ্যেস করছেন কেন? আপনার কর্তব্য আপনি পালন করুন তা না হলে আমরা আইনি ব্যবস্থা নেব। এই কথা বলার পর আবার 'স্বস্তিকা' নিয়মিত পেতে শুরু করেন।

কথা হচ্ছে, সবজায়গায় রাজনীতি করা বন্ধ করতে হবে। বিশেষ করে সরকারি দপ্তরে বসে রাজনীতি না করে কর্তব্য পালনের উপর জোর দিলে দেশের পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই হবে। ভেদাভেদ নীতি প্রয়োগে মন্দ ছাড়া ভালো কাজ হয় না।

—**জয়রাম মণ্ডল,**
কলকাতা-৬।

উত্তপ্ত কাশ্মীর

সম্প্রতি কাশ্মীরে বিজেপি-পিডিপি, কোয়ালিশন সরকার গঠিত হওয়ার পর দু'টো ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক উত্তাপ বৃদ্ধির ফলে এই পত্রের অবতারণা। সেখানে সরকার গঠন করার পরেই মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদ দাবি করেছেন ২০০৩ সালে সংসদ ভবন আক্রমণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত আফজল গুরুর দেহাবশেষ কাশ্মীর নিয়ে আসতে হবে। উল্লেখ্য, উক্ত অপরাধে আফজল গুরুর ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ জেলে ফাঁসি দিয়ে এবং জেলের ভেতরেই তাকে কবর দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ঘটনা হলো— কুখ্যাত বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা মশরত আলমকে রাজ্য সরকার গত ৭ মার্চ ২০১৫ জেল থেকে মুক্তি দেয়। তার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হলো ২০১০ সালে পাথর ছোঁড়া আন্দোলনে ডাক দেওয়া, তাতে প্রায় ১২০ জন ভারতীয় সেনাকর্মী এবং পুলিশ নিহত হয়। এ ছাড়াও তার বিরুদ্ধে আরো ১৭টি গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এখানে মুফতি মহম্মদ সঈদের একটা কীর্তির কথা জনসাধারণের গোচরে আনছি। তিনি যখন দিল্লীতে ইউপিএ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তখন ষড়যন্ত্র করে তাঁর কন্যা মেহবুবা মুফতিকে অপহরণের নাটক তৈরি করে ৫ জন উগ্রপন্থী কাশ্মীরি জঙ্গিকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে তার কন্যাকে অপহৃতদের হাত থেকে মুক্ত করেন। কিসের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সঈদ আফজল গুরুর দেহ কাশ্মীর নিয়ে যেতে চাইছে? ইতিপূর্বে জে কে এল এফ এ-র প্রতিষ্ঠাতা মুকবুল ভাটের মৃতদেহ দিল্লীর তিহার জেল থেকে কাশ্মীরে ফিরিয়ে আনার জন্য ফেব্রুয়ারি ২০০৩-এর প্রথম সপ্তাহে দু'বার বিশাল বিক্ষোভ মিছিল হয় কাশ্মীরে। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালে দিল্লীর তিহার জেলে মুকবুলের ফাঁসি হয় এবং জেল চত্বরে তাকে কবর দেওয়া হয়। গত ৪ এপ্রিল ২০০৩ তারিখে হিজবুল জঙ্গিনেতা সাইফুলের মৃতদেহ কবর দেওয়ার সময় ২৫ হাজারেরও বেশি পাকপ্রেমী মুসলমান তার মৃতদেহ নিয়ে সমাধিস্থলে পৌঁছয়। শোকে অনেক বৃদ্ধ ও মহিলা কাঁদতে কাঁদতে তার দেহ প্রদক্ষিণ করে এবং আজাদির জন্য মুহুর্মুহু ধ্বনি দিতে থাকে।

উল্লেখ্য, সেনাবাহিনীর সঙ্গে গুলি বিনিময়ের সময় এই কুখ্যাত জঙ্গি নিহত হয়। ১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধের সময় কলাইকুণ্ডা বিমান ঘাঁটি আক্রমণ করতে এসে এক পাক বৈমানিক ভারতীয় বায়ুসেনার গুলিতে বিমান-সহ ভূপতিত হয়ে নিহত হয়। ভারতীয় সেনারা তাকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় খড়্গপুরে কবরখানায় কবর দেয়। তার নামাজ-ই-জানাজয়ে হাজার হাজার পাকপ্রেমী মুসলমান সমবেত হয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানায়। ১৯৭৫ সালে এই পত্রলেখক খড়্গপুরে পোস্টিং থাকার সময় দেখেছে যে, তার মৃত্যুদিনে পাকপ্রেমী মুসলমানরা কবরে ফুল, মালা, ধূপকাঠি মোমবাতি দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। এই উগ্রপন্থীদের ভারতের মাটিতে কবর দিলে পরবর্তীকালে ওই কবরস্থানগুলি পাকপ্রেমী মুসলমানরা একটা মাজার তৈরি করবে। অতএব ভারত সরকারের উচিত এদের দেহ বৈদ্যুতিক চুল্লিতে দাহ করে ছাই সমুদ্রে নিক্ষেপ করা। সম্প্রতি ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করে আমেরিকা তার দেহ সমুদ্রের অতল জলে ডুবিয়ে দেয়। কোনো মুসলমান দেশ বিধর্মী সেনার তাদের দেশে মৃত্যু হলে সেই ধর্মের নীতি অনুসারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে দেয় না। রবীন্দ্র কৌশিক নামে ভারতীয় গোয়েন্দা পাকিস্তানে ধরা পড়ার পর ১৮ বৎসর পাক জেলে কাটিয়ে ২০০২ সালে সেখানে মারা যায়। পাক কর্তৃপক্ষ তাকে অপমানজনক ভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে কবর দেয়। কারণ কোনো কাফেরের মৃতদেহ (বিধর্মী হিন্দু) কাঁধে বহন করা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ। তাসখন্দে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু হলে তার কফিন কাঁধে বহন করার জন্য তদানীন্তন পাক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান মৌলবাদী মুসলমানদের দ্বারা প্রচণ্ড ধিকৃত হন। এই অপরাধে তাঁর কয়েক দিনের নামাজ রোজার ফরজ (পুণ্য) বাদ দেওয়া হয়েছিল। ১৯ এপ্রিল ২০০১ তারিখে বাংলাদেশ

রাইফেলের হাতে নিহত জনৈক ভারতীয় বিএসএফ জওয়ানের দেহ হাত-পা বেঁধে বাঁশে ঝুলিয়ে বাংলাদেশ সরকার ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করে। অতএব আমার প্রশ্ন, পাকিস্তান অথবা মুসলমান দেশে হিন্দুদের মৃত্যু হলে যদি তাদের কবর দেওয়া হয় তবে ভারতে কেন মুসলমান উগ্রপন্থীদের দেহ পুড়ে ছাই করা হবে না?

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

আরব টাইমস

'সব হিন্দুকে এক ঘাটে জল খাওয়াতে নয়— অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ডাক দিল সঙ্ঘ' গূঢ়পুরুষের কলমে প্রকাশিত খবর পড়ে জানতে পারলাম আনন্দবাবাজর পত্রিকায় একটি খবর ছাপা হয়েছিল 'সঙ্ঘ এবার এক ঘাটে জল খাওয়াবে হিন্দুদের' শিরোনামে। খবরটি পড়ে বিস্মিত হইনি। হিন্দুদের নিজেদেরই স্ব-চেতনায় একঘাটে জল খাওয়া উচিত দেরি হওয়ার আগেই। মুসলমানরা যে ৭৩২ খৃষ্টাব্দ থেকেই কোরানের ও মৌলবীদের নির্দেশে একঘাটে জল খেয়ে চলেছে। তার খবর না জানার ভান করে কোনো 'বাজারের'ই সুবিধা হবে না তা বলতে পারি।

স্বস্তিকার সাংবাদিক বলেছেন চক্রান্তমূলক ভাবেই খবর বিকৃত করা হয়েছে। তার বহু নজির আছে। জনপ্রিয় কড়া ডোজের স্পষ্টবাদী কালনার লেখক প্রয়াত শিবপ্রসাদ রায় একটি বইয়ে লিখেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকাকে বলা হয় 'আরব টাইমস্'। সারা দেশজুড়ে এমন অসংখ্য দেশীয় আরব টাইমস চালু আছে। তাদের কাজ মুসলমান মৌলবাদী শক্তির প্রসার ঘটিয়ে স্বজাতির অস্তিত্ব বিনাশ করা। তাই এই সব কাগজে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোনো মুসলমানি হামলা হলে তার খবর প্রকাশ করে না, চেপে যায়। মনে হয় তার জন্য ওইসব কাগজ আরব দুনিয়া থেকে কোটি কোটি পেট্রোডলার পায়। তাই তারা তার নিজের আত্মীয়া মুসলমানের হাতে ধর্ষিতা হলেও সে ঘটনাকে খবর করে না।

প্রতিবেদনটিতে একটি লাইনে ছিল ৭০ শতাংশ হিন্দুরা অসংগঠিত বলেই ৩০ শতাংশ সংগঠিত মুসলমান ৭০ শতাংশ হিন্দুর ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হয়েছে এই রাজ্যে। বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের হিন্দুদের করুণ অবস্থার খবর জেনেও এদেশের হিন্দুদের যে চেতনা হচ্ছে না তা পরিষ্কার। কিন্তু হিন্দুদের সংগঠিত করার কাজ করার জন্য হিন্দু সংগঠনগুলির তৎপরতা কোথায়? বিভিন্ন জায়গায় দেবদেবীর মূর্তি ভেঙে দিচ্ছে মুসলমান দুষ্কৃতীরা। পুলিশ নির্বিকার রাজনৈতিক চাপে। তার বিরুদ্ধে প্রচার কোথায়?

যে সব পত্রপত্রিকা জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে থাকে তাদেরও অনেকটা দায় আছে। পত্র পত্রিকাগুলির বিজ্ঞাপন দিয়ে ব্যাপক প্রচার করা যাতে মিত্র-মিডিয়ার প্রসার বাড়ে আর শত্রু-মিডিয়া মানুষ চিনতে পারে এ বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত সকলেরই।

—**শ্রী ভীতুশ্রী কলমকথক,**
কল্যাণী, নদীয়া।

নবদ্বীপ থেকে শিয়ালদহ

প্রকৃতির ভাঙাগড়ার পরিবর্তিত রূপের সঙ্গে ইতিহাস এবং ভুগোলের এক নিবিড় সম্পর্ক আছে। গো-মুখ থেকে আগত গঙ্গা সমুদ্রের সঙ্গে মেলবার আগে নানা দ্বীপ তাঁর নিজস্ব কারুকাজ হিসাবে সৃষ্টি করে রেখেছে। নবদ্বীপও এমন ধরনের সৃষ্টি হওয়া একাধিক দ্বীপ বিশেষ। কেউ বলেন নতুন-সৃষ্ট দ্বীপ বলে এর নাম হয়েছিল নবদ্বীপ। কেউ বলেন কোনো সময় কোনো এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নয়টি দীপ জ্বালিয়ে যোগ সাধনা করেছিলেন বলে তার থেকেই নাম হয় নবদ্বীপ বা নদীয়া।

প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের, মূলত নরহরি কবিরাজের 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' থেকে জানা যায়— পৃথক পৃথক কিছু দ্বীপ নিয়ে নবদ্বীপ নাম হয়। কিন্তু একগ্রাম হিসাবে সে মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে যায়। অগ্রদ্বীপের পরে শুরু নবদ্বীপ। (১) মধ্যদ্বীপ— এই দ্বীপ থেকে নবদ্বীপ শুরু। এটি মাজদিয়া অঞ্চল নিয়ে গঠিত। (২) সীমন্তদ্বীপ— এই আরও দক্ষিণে গঙ্গার পূর্বপাড়ে। এর মধ্যে রয়েছে কাসিয়াডাঙা, বেলপুকুরিয়া, সরডাঙা ইত্যাদি স্থান। (৩) রুদ্রদ্বীপ— সীমন্তদ্বীপের অন্তর্গত অন্যতম একটি স্থানের নাম ধর্মদহ। এই ধর্মদহ থেকে খানিক দূরে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে হলো রুদ্রদ্বীপ। এই রুদ্রদ্বীপ অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে পূর্বস্থলী, শঙ্করপুর, রাদুপুর বা রুদ্রডাঙা। (৪) অন্তর্দ্বীপ— রুদ্রদ্বীপ থেকে এগিয়ে দক্ষিণদিকে জলের চক্রকার প্রবাহের অন্তর্ভাগ হলো অন্তর্দ্বীপ। (৫) মায়াপুর— মিঞাপুর, ভারুইডাঙা ইত্যাদি গ্রাম নিয়ে মায়াপুর। এই মায়াপুরেই নিমাই-এর জন্ম হয়। আর অন্তর্দ্বীপ ছিল প্রাচীন নবদ্বীপের রাজধানী। (৬) জহ্নুদ্বীপ— জহ্নুদ্বীপের নাম জাননগর। অন্তর্দ্বীপের বল্লালদীঘি নামে একটি দীঘি আছে, এই দীঘির পশ্চিমপাড়ে একডালা, মহৎপুর, মদ্রদ্রুমদ্বীপ--- এই দ্বীপের দক্ষিণে হলো জহ্নুদ্বীপ। (৭) ঋতুদ্বীপ--- জহ্নুদ্বীপের দক্ষিণদিকে রাউতপুর, বিদ্যাসাগর ইত্যাদি গ্রাম নিয়ে হলো ঋতুদ্বীপ। (৮) গোদ্রুমদ্বীপ— অন্য পাড়ে হলো গোদ্রুমদ্বীপ। (৯) বোলদ্বীপ— গোদ্রুমদ্বীপ থেকে আরও দক্ষিণে সমুদ্রগড় ইত্যাদি অঞ্চল নিয়ে হলো বোলদ্বীপ। এই নয়টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত নবদ্বীপ। এরপরে দক্ষিণদিকে আরও দু'টি দ্বীপ যা আজ মানুষের খুবই চেনা। খড়্গদ্বীপ--- যার বর্তমান নাম খড়দহ। শৃগালদ্বীপ কলকাতার কাছাকাছি অধিবাসীদের এবং সারা পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতের মানুষের চেনা স্থান— শিয়ালদহ।

—**অমিত ঘোষদস্তিদার,**
সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

শাশ্বত জীবনমূল্যবোধের নাম ‘গীতা’

শবরী ঘোষ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— ‘‘গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীন্ লোকান্ পালয়াম্যহম্।’’ গীতাকে ভারতের জাতীয় ধর্মগ্রন্থ ঘোষণা করা উচিত কিনা এ নিয়ে কিছু অনভিপ্রেত বিতর্ক উঠেছে। আমরা জানি, পাশ্চাত্যের ‘রিলিজিয়ন’ ও ভারতের ‘ধর্ম’— দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। পাশ্চাত্যে ‘রিলিজিয়ন’ শব্দটি ঈশ্বরবিশ্বাস ও উপাসনা পদ্ধতির সমার্থক। কিন্তু ভারতে ‘ধর্ম’ বলতে আমরা বুঝি ‘যা ধারণ করে রাখে’। এখানে ধর্ম কোনো নির্দিষ্ট দেবতার পূজা বা মন্দিরে যাওয়া, উপবাস করা, ব্রত পালন করা— এই জাতীয় ‘রিচ্যুয়াল’-এর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এখানে ধর্ম হলো জীবনদর্শন। সেই দর্শনের মূল সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়। ঐহিক এবং পারমার্থিক জীবনে এমন কোনো প্রশ্ন নেই যার উত্তর এই গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অ-হিন্দু, এমনকী ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন ব্যক্তি পর্যন্ত এই গ্রন্থ পাঠ করলে জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে যাবেন।

মৃত্যুকে ভয় পায় না এমন মানুষ বিরল। মৃত্যু আপনজনের থেকে বিচ্ছেদ ঘটায়। কয়েক বছর আগে সংবাদপত্রে একটি ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়েছিল। মায়ের মৃত্যুশোক সহ্য না করতে পেরে দুই কিশোর-কিশোরী ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। স্বামীর অকালমৃত্যুর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে স্ত্রী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। গীতা বলছে, নশ্বর দেহের বিনাশ হলেও দেহাভ্যন্তরস্থিত আত্মার বিনাশ হয় না। ২/২২ তম শ্লোকে আছে—

‘‘বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।’’

অর্থাৎ, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনই আত্মাও জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর গ্রহণ করে। আবার, যারা আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান তাদের একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ‘জাতস্য হি ধ্রুবো মৃর্ত্যুঃ’। ‘জন্মিলে মরিতে হবে। অমর কে কোথা কবে।’ এটি অবশ্যম্ভাবী

বিষয়, তাই শোক করা উচিত নয়।

আজকের দিনে অধিকাংশ অভিভাবক-অভিভাবিকা চান, তাঁদের সন্তান হবে স্কুলের সেরা ছাত্র-ছাত্রী। এর সঙ্গে নাচ, গান, আঁকা, সাঁতার— এসবেও দু' একটা মেডেল চাই। প্রথম শ্রেণী থেকেই শুরু হয় শিশুদের ইঁদুরদৌড়ে সামিল করার পালা। দিনে দিনে চাপ আরো বৃদ্ধি পায়। প্রত্যাশার চাপ পূর্ণ না হলেই ড্রাগসেবন বা আত্মহত্যা। এমনকী মাধ্যমিকে প্রথম দশের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ অভিযোগ করেছে 'আরো ভালো নম্বর আশা করেছিলাম।" নম্বরের আশা না করে 'পড়াশুনো আমার কর্তব্য' এই কথাটা ভেবে যদি বই-এর পাতায় মন দেওয়া যায় তবেই ব্যক্তিবিশেষ ও সমাজের মঙ্গল। গীতা বলছে,

''কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মনি।" (২/৪৭)

অর্থাৎ কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনো নয়।

কর্মফল যেন তোমার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়, কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না থাকে।

'রিয়েলিটি শো'-এ বিচারকের বকুনি খেয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যেতে হয়েছে এক কিশোরীকে— কয়েক বছর আগে সংবাদপত্রের শিরোনামে এসেছিল এই সংবাদ। অনেকে মন্তব্য করলেন, ছোটদের মধ্যে এই ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়াই উচিত নয়। অথচ ওই কিশোরীটি প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হলে কিন্তু সে সমাজে 'সেলিব্রিটি'র মর্যাদা পেত! এখন প্রশ্ন হলো, ভালো 'পারফর্ম' না করলে একজন প্রতিযোগী অভিভাবক-সম বিচারকের কাছে বকুনি খেতেই পারে অথবা প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়তেই পারে। তা বলে বিষয়টাকে এমন নেতিবাচকভাবে নিতে হবে?

''যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে।" (৪/২২)

অর্থাৎ, যিনি অযাচিত লাভে পরিতুষ্ট, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, মাৎসর্যবর্জিত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন তিনি কর্ম করেও বন্ধন প্রাপ্ত হন না।

জীবনে সমস্যার সূচনা হয় অত্যধিক আসক্তি থেকে। সাংখ্যযোগে আছে—

''ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।। (২/৬২)
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।" (২/৬৩)

অর্থাৎ কোনো বিষয়ের চিন্তা করতে করতে মানুষের তাতে আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে কামনা, কামনা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রম থেকে বুদ্ধিভ্রম আর বুদ্ধিভ্রম থেকে বিনাশ। আসক্তি কীভাবে বিনাশ ডেকে আনে সে প্রসঙ্গে কয়েক বছর আগের একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। মদ্যপানে আসক্ত এক যুবক কোনো এক পার্টিতে বার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে বারগার্লের কাছে গিয়ে মদ চায়। বারগার্ল রাজি না হওয়ায় তার মদ্যপানের কামনা চরিতার্থ হলো না। ফলে ক্রোধ জন্মাল তার মনে। নামী পরিবারের সন্তান ওই যুবকটি ভাবল, ''আমাকে না বলার সাহস ওর হলো কী করে?" ক্রোধ থেকে এই সম্মোহ আর সম্মোহ থেকে বুদ্ধিবিভ্রম হলো ওই যুবকটির। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল মেয়েটিকে। রক্তাক্ত মেয়েটি লুটিয়ে পড়ল। যাবজ্জীবন সাজা পেল যুবকটিও।

কাম ও ক্রোধ দমন করার বিষয়ে গীতার শ্লোক—

''এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।" (৩/৪৩)

বালগঙ্গাধর তিলক এই শ্লোকটির মর্মার্থ করেছেন— ''নিজেই নিজেকে সংযত করিয়া কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে মারিয়া ফেল।" আত্মসংযম এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা মানুষের পরম শত্রু কামকে দমন করা যায়। কামকে দমন করা গেলে ক্রোধেরও উপশম হবে।

অনেক তথাকথিত প্রগতিশীল শিক্ষিত মানুষ রিক্সাওয়ালা, বাসের কন্ডাক্টর অথবা রাস্তার ঝাড়ুদারকে 'তুই' সম্বোধন করেন। ভাবখানা এমন, ওরা কি 'আপনি' সম্বোধনের যোগ্য? দূরপাল্লার সি এস টি সি বাসে মেয়েদের সিট ফাঁকা পড়ে থাকতে দেখে এক সত্তরোর্ধ্ব 'মাছওয়ালা' সেখানে বসেছিলেন। পরিচিতা এক স্কুলের দিদিমণি, যাঁর বয়স চল্লিশের আশেপাশে, সেই বাসে উঠলেন। বৃদ্ধ সমম্ভ্রমে তাঁকে সিট ছেড়ে দিলেও 'দিদিমণি' ভ্রূ কুঁচকে সহযাত্রীকে বললেন— ''এই ছোটলোকগুলো যে কেন এইসব বাসে ওঠে? উঠেছিস ওঠ্, আবার বসতে যাবি কেন?" এঁদের জানা উচিত যে,

''বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।" (৫/১৮)

অর্থাৎ বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গোরু, হাতি ও কুকুরে পণ্ডিতগণ সমান দৃষ্টিসম্পন্ন হন।

ইসলাম ও খৃষ্টান মূলত এই দুই ধর্মের মানুষ বলপূর্বক অথবা অর্থের প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক মানুষকে ধর্মান্তরিত করে। এদের জানা উচিত,

''যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।" (৪/১১)

অর্থাৎ হে পার্থ, যারা যেভাবে আমাকে উপাসনা করে, আমি তাদের সেভাবেই অনুগ্রহ করি। মানুষ সর্বপ্রকারে আমার পথই অনুসরণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'যত মত তত পথ'। ঈশ্বর, আল্লাহ্, গড যে নামেই ডাকা হোক না কেন তা স্বয়ং সেই একমেবাদ্বিতীয়মের নিকট পৌঁছচ্ছে এই জ্ঞান হলে তরবারির

ভয় দেখিয়ে বা গোমাংস খাইয়ে নিশ্চয়ই বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ করা বন্ধ হবে।

অন্য ধর্মাবলম্বী বহু মানুষ হিন্দুদের 'বহুত্ববাদী' বলে নিন্দা করেন। কিন্তু গীতা তাঁদের ওই ভ্রান্তি বিদূরিত করবে।

''যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।। (৯/২৩)
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাঽতশ্চ্যবন্তি তে।। (৯/২৪)

অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! যারা অন্য দেবতার প্রতি ভক্তিমান হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করে তারাও অবিধিপূর্বক আমাকেই পূজা করে। আমিই সর্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা। কিন্তু তারা আমাকে যথার্থরূপে জানে না বলে সংসারে পতিত হয়। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ঈশ্বর একজনই। দেবতারা ঈশ্বরের শক্তিবিশেষের প্রকাশমাত্র। ঈশ্বর থেকে পৃথক অন্য কোনো শক্তির অস্তিত্ব নেই। বাইবেল বা কোরানেও এই কথাই বলা হয়েছে। তারপরেও যারা হিন্দুদের 'তেত্রিশ কোটি দেবতা' নিয়ে বিদ্রূপ করে সম্ভবত তাদের জন্যই 'ফুটো কলসীর গর্জন বেশি' প্রবাদটি রচিত হয়েছে।

দৈবাসুর সম্পদবিভাগযোগের প্রথম তিনটি শ্লোকে দৈবীস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত হয়েছে। এগুলি হলো— নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, তপস্যা, জীবে দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, কুকর্মে লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৃতি, পরিচ্ছন্নতা, জিঘাংসারাহিত্য এবং নিরহঙ্কার। প্রসঙ্গত, যজ্ঞ বলতে কিন্তু গীতায় কেবলমাত্র হোমযজ্ঞের কথা বলা হয়নি। দ্রব্যদান, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, ঈশ্বরে সর্বকর্মসমর্পণ, প্রাণায়াম ও শাস্ত্র অধ্যয়নকেও যজ্ঞ বোঝানো হয়েছে। আজকের সমাজে এই গুণগুলির বড় অভাব। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যদি ওই গুণগুলোর ছিটেফোঁটাও থাকে, তবে সমাজ কি অনেক বেশি সুন্দর হয়ে উঠবে না?

দৈনন্দিন জীবনে কী কী করা উচিত আর কী কী অনুচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে সে বিষয়ে সবিশেষ বলা হয়েছে। ১৭/৮ শ্লোকে বলা হয়েছে আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, চিত্তপ্রসন্নতা ও রুচিবৃদ্ধিকর সরস, স্নিগ্ধ, সারবান ও প্রীতিকর খাদ্য সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের প্রিয়। পরবর্তী শ্লোক দুটিতে অতি ঝাল, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অনেকক্ষণ পূর্বে পাক করা, দুর্গন্ধযুক্ত, পোড়া, বাসি, উচ্ছিষ্ট প্রভৃতি খাদ্যগ্রহণ রাজসিকতা ও তামসিকতার পরিচায়ক বলে কথিত হয়েছে। চিকিৎসকরাও কিন্তু রাজসিক ও তামসিক খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। যে বাক্য অন্যের মনোকষ্টের কারণ হয় তা পরিহার করা, সত্য অথচ প্রিয় বাক্য বলা, মনের প্রসন্নতা, অন্যের সঙ্গে ব্যবহারে কপটতা বর্জন করা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে। অনেক মানুষকে বলতে শুনেছি, ''আমি অমুকের অত উপকার করলাম। বিনিময়ে কী পেলাম? কিছুই না।'' সমাজে কারোর প্রতি এতটুকু উপকার করলে আমরা আশা করি, বিনিময়ে সে-ও আমার কোনো 'কাজে আসবে'। নিদেনপক্ষে, আমার ওই উপকারের কথা 'শতমুখে লোককে বলে বেড়াবে'। প্রত্যুপকারের আশায় যে দান করা হয় তা হলো রাজসিক দান। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

''দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।'' (১৭/২০)

অর্থাৎ দান করা কর্তব্য এইরূপ মনে করে উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করে প্রত্যুপকারের আশা না রেখে যে দান করা হয় তা হলো সাত্ত্বিক দান।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 'ধ্যান'-এর কথা বলা হয়েছে। 'ধ্যান' মানুষের পক্ষে কত উপযোগী তা বিশ্বের প্রায় সব দেশের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা স্বীকার করেছেন। ম্যাক্সম্যুলার অলডাস হাক্সলি, ক্রিস্টোফার ঈশারহুড, এমার্সন প্রমুখ পণ্ডিতরা গীতাকে সমাদর করেছেন। অথচ আমাদের দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা গীতাকে নিছক একটি 'রিলিজিয়স' বই-এর তকমা দিয়ে এর জাতীয় গ্রন্থরূপে ঘোষিত হওয়ার বিরোধিতা করছেন! মনে প্রশ্ন জাগে, আদৌ এঁরা কখনো গীতা পড়েছেন তো? অর্জুন বলেছিলেন—

''নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।'' (১৮/৭৩)

হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হয়েছে। আমার কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞান লাভ হয়েছে। নিঃসংশয় হয়ে স্থির করেছি তোমার কথামতো কাজ করব। সুতরাং বুদ্ধিজীবীরা অযথা তর্কবিতর্কের সময় নষ্ট না করে বার বার গীতাগ্রন্থ পাঠ করলে তাঁদের বোধোদয় ঘটবে। আর তখনই উপলব্ধি করা যাবে শাশ্বত জীবনমূল্যবোধের নাম 'গীতা'।

Design's For Modern Living
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12,
Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

কালীপদ ডাক্তার এবং একটি কুকুর

কৌশিক গুহ

পায়ে সবসময় কম দামের ঢাকা জুতো থাকলেও তাঁকে অনেকে বলত খালিপদ। ওই খালিপদ নামটা আসল নামের সঙ্গে মিল রেখে পাড়ার লোকজন তৈরি করেছিল। কালীপদ ডাক্তারকে সেজন্যে ছেলেরা বলত খালিপদ ডাক্তার। অসম্মান করার একটুও উদ্দেশ্য ছিল না। বরং কথাটার মধ্যে ছিল শ্রদ্ধার প্রকাশ। বিদেশে 'বেয়ার ফুট ডকটর' কথাটা খুব চালু ছিল একসময়। গ্রামেগঞ্জে দূরদূরান্তে চলে

যেতেন ডাক্তাররা জঙ্গল জলা নালা পেরিয়ে। হয়তো সকলের প্রথাগত তালিম ছিল না। ডিগ্রিধারী নন। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে মোটামুটি ধ্যানধারণা ছিল। ডাকলেই ছুটে যেতেন রাতেবিরেতে। কারণ কেউ ডাকলে সাড়া দিতে হবে। সেটাই ডাক্তারের প্রথম কাজ। ব্যাগে থাকত ওষুধপত্র আর চিকিৎসার সরঞ্জাম। দিনেরবেলা সাইকেল চালিয়ে যেতেন। ডাকতেন বাইরে থেকে, বাড়ির ছোটোদের কারও নাম ধরে। দেখতেন। ওষুধপত্র দিতেন। কিংবা আনিয়ে নিতে বলতেন। অনেক সময় নিজে ওষুধ কিনে রোগীর বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন। ডাক্তারবাবুর দক্ষিণা নামমাত্রই। কেউ দিয়েছে, কেউ দিতে পারেনি। ডাক্তার কারও কাছে চাননি কিছু। সামান্যই চাহিদা জীবনে। সাধারণ জীবনযাপন। গৃহিণী নির্মলা একেবারে নির্মল আনন্দে সব মেনে নিয়েছিলেন ওই গ্রামে আসার পরে। পাঁচ ছেলে, তিন মেয়ে। কষ্ট করে বড় হয়েছেন কালীপদ নিজে। ছেলেমেয়েরা প্রথম থেকে মনকে বড়ো করতে শিখেছে। আশপাশের দশ-বিশটা গাঁয়ের বড় কাছের মানুষ। এক ডাকে সকলে সাড়া দেয়, শ্রদ্ধা করে। একেবারে দিলখোলা মানুষ। সববয়সীর প্রিয় হওয়ার ক্ষমতা ছিল বরাবর।

রাতবিরেতে দূর গ্রাম থেকে ডাক পড়লে যেতেন। কখনও বলতেন না, 'কাল যাবো'। অচেনা রাস্তা নয়, তবে রাতের দিকে সাইকেল চালাতেন না। অসুবিধে হোত। যে বাড়ির লোক ডাকতে আসত তাদের বলতেন, 'একটু বসো, তৈরি হয়ে নিচ্ছি।' ডাক্তারবাবু বেরিয়ে আসতেন ধুতি পাঞ্জাবির উপর চাদর জড়িয়ে। শীত পড়ছে। কতক্ষণ বাদে ফেরা যাবে বলা

সম্ভব নয়। গৃহিণী জানেন দেরি হতে পারে রোগীর অবস্থা জটিল হলে। ডাক্তারবাবু গৃহিণীকে বলতেন, 'তুমি খেয়ে নিও। আমি ফিরে ডাকবো।' নির্মলা এরকম দেখছেন বিয়ের পর থেকে। প্রথম প্রথম রাগ হোত। পরে বুঝেছেন, এটা কর্তব্যের ডাক। বাধা দিতে নেই।

অন্যদিনের মতো সেদিনও রোগীর বাড়ির লোকদের সঙ্গে চললেন কালীপদ। চার-পাঁচটা গ্রাম ছাড়িয়ে অনেকটা পথ। তাঁর চার ব্যাটারি টর্চ সঙ্গে। ব্যাগটা নিয়েছে একজন। রাতে বেরোলে একটা ছড়ি সঙ্গে নেন। আসলে সেটা ছড়ি নয়। গুপ্তি। ছড়ির মতো। প্যাঁচ খুলে টানলে লম্বা ছুরি বেরোয়। কোনোদিনও খুলতে হয়নি। নিরাপত্তার কথা ভেবে সঙ্গে রাখা। রোগী দেখার পর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। রোগীর অবস্থা ভালো ছিল না। কালীপদ সামলে দিলেন। বললেন, 'আপাতত ঠিক আছে। কাল খবর দিও।'

ডাক্তারবাবু বাড়ি ফিরবেন। অনেক রাত হয়েছে। রোগীর বাড়ির কেউ কেউ আসতে চাইলেন। কালীপদ বললেন, 'না না, কাউকে আসতে হবে না। চেনা পথ, জ্যোৎস্না আছে, টর্চ রয়েছে। চলে যাবো।' কালীপদ কিছুটা আসার পর বুঝতে পারলেন পিছনে একটা কুকুর আসছে। চেনা কুকুর নয়। কালীপদ কিছু বললেন না সেই সঙ্গীকে। আসছে আসুক।

বাড়িতে ঢোকার আগে গৃহিণীকে ডেকে বললেন, 'কিছু খাবার দাও। এতটা পথ আমার সঙ্গে একটা অচেনা কুকুর এসেছে। ওকে খেতে দাও। আমি হাত-পা-মুখ ধুয়ে পরে খাবো।' নির্মলা একটা কলাপাতায় ভাত তরকারি আরও কিছু নিয়ে এলেন চটপট।

এসে দেখলেন কোথাও কুকুর নেই। ডাকলেন, 'আয় বাবা, গরিবের বাড়ি দুমুঠো খেয়ে যা।' দাঁড়িয়ে থাকলেন। কালীপদ হাত মুখ ধুয়ে এসে দাঁড়ালেন গৃহিণীর পাশে। বললেন, 'খেতে দিলে ওকে?' নির্মলা বললেন, 'কোথায় গেল! কত ডাকছি।'

কালীপদ তাঁর জোরালো টর্চ জ্বেলে আলো ছুঁড়ে দিলেন এদিক-ওদিক। খুঁজতে লাগলেন। কোথাও কিছু নেই। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। ব্যাঙ ডাকছে। নির্মলা খাবারটা বাইরে রেখে বললেন, 'তোমার খাবার তোমার থাক।' কালীপদ ভয়ডরহীন মানুষ। তিনি অবাক। গিন্নিকে জিগগ্যেস করলেন, 'ব্যাপার কি বলো তো? এতটা পথ আমার সঙ্গে এলো! কখনও আগে, কখনও পরে!'

নির্মলা দু-হাত কপালে তুলে প্রণাম জানালেন কার উদ্দেশে। কালীপদকে বললেন, 'তোমাকে পথ দেখিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। আমাদের বড় বন্ধু।'

কালীপদ ওই ঘটনার কথা অনেককে বলেছেন পরে। কিন্তু কোনোদিনই সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

ছোটোদের বই অনুরাগ জাগিয়েছে প্রশান্ত

ছোটোদের হাতে বই তুলে দেওয়ার মধ্যে অন্যরকম আনন্দ আছে— এটা প্রশান্ত বোঝে। ছোটোদের সঙ্গে তার খুব ভাব। তাদের নিয়ে খেলা বেড়ানো গল্প করা হইচই করতে ভালো লাগে। সময় দিব্যি কাটে। ছোটোরা তাকে বন্ধু ভাবে। গল্পের ভাঁড়ার উপচে পড়ছে। নতুন নতুন গল্প শোনে ছোটোরা। যারা বড়ো হয়েছে তারা সবসময় স্বীকার করে প্রশান্তদার কাছে কত গল্প শুনেছি হিসেব নেই। শোনা গল্পগুলো মনের মধ্যে ছবি হয়ে গেঁথে আছে। ছোটোদের জন্যে বই কিনত প্রশান্ত। জন্মদিনে উপহার দিত বই। স্কুলে নতুন ক্লাসে উঠলে বই পেত ছোটোরা প্রশান্তদার কাছে। পুজোর আগে উপহার দিত বই। আর রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনেও ছোটোরা পেত বই। কেউ কেউ একই বই দুবার পেয়েছে। প্রশান্তদা বলত, 'মনে রাখতে না পারায় ভুল হয়েছে। তবে বই তো। রেখে দিস। পরে অন্য কেউ পড়বে।' এরকম ব্যাপার ঘটত বলে প্রশান্তদা একটা ছোট নোট বুকে লিখে রাখত কাকে কি বই দিয়েছে। বইয়ের মধ্যে যে মজা আছে সেটা বুঝিয়ে দিত ভালোভাবে। পছন্দের বই বেছে নেওয়ার মধ্যে মজা থাকে। অনেকে বড়ো হয়ে শৈশব-কৈশোরের দিনে পাওয়া বইগুলো আগলে রেখেছে যত্ন করে। বইয়ের মধ্যে যে লুকানো হরেকরকম মজা সেটা প্রশান্তদাই শিখিয়েছিল পাড়ার ছোটোদের। সব বাড়ির বড়োরা জানতেন, ছেলেভোলানোর কাজে দারুণ দক্ষ প্রশান্ত। তাদের সঙ্গে মেতে থাকে বলে তার মনের বয়স এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১.'শজারুর কাঁটা' কে লিখেছেন? তাঁর জন্ম ও মৃত্যু কবে? তাঁর ছদ্মনাম?

২.নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর আসল নাম কি? তিনি কোন পেশায় ছিলেন?

৩.বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় কোন ছদ্মনামে লিখতেন? তাঁর পেশা কি ছিল?

৪.শিবরাম চক্রবর্তীর কোন কাহিনী নিয়ে ঋত্বিককুমার ঘটক একটি ছবি তৈরি করেন?

৫.'অতিথি' গল্পের প্রধান চরিত্র কে?

উত্তর : ১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩০ মার্চ ১৮৯৯-২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭০। চন্দ্রহাস। ২. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। অধ্যাপক। ৩. বনফুল। চিকিৎসা। ৪. বাড়ি থেকে পালিয়ে। ৫. তারাপদ।

ফিরে পড়া

মা

দেবেন্দ্রনাথ সেন

(১৮৫৮-১৯২০)

তবু ভরিল না চিত্ত। ঘুরিয়া-ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম। বন্দিনু পুলকে,
বৈদনাথে, মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে;
হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া,
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে,
'জয় বিশ্বেশ্বর' বলি ভৈরবে বেড়িয়া,
করিলাম কত নৃত্য; প্রফুল্ল আশ্রমে,
রাধা-শ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীতগোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া-গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে-কুঞ্জে; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জ-মালা।
তবু ভরিল না চিত্ত। সর্বতীর্থ-সার,
তাই মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার।।

মেয়েদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্কীর্ণ কেন?

চম্পা মণ্ডল

নারীজাতি সৃষ্টির উৎস। সত্যিই তো নারীজাতি সমাজের আদর্শ, যার প্রেরণার অপেক্ষায় থাকে আগামী প্রজন্ম। এক শ্রেণীর মানুষের কাছে নারীজাতি খুব সম্মানের। তাঁরা নারীজাতিকে মা বলে মনে করেন। বাসে, ট্রেনে, রাস্তায় সব জায়গায় তাঁরা নারীর সম্মান বজায় রাখার চেষ্টা করেন এবং সম্মান প্রদান করে থাকেন। কিন্তু এ দৃশ্য আজ ক্রমেই বিরল হয়ে পড়ছে।

আর এক শ্রেণীর মানুষ নারীকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। নারীকে এরা প্রসাধনী সামগ্রী বলে মনে করেন। যেমন বর্তমানে বিজ্ঞাপনে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের নানাভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কখনো কখনো শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে নারীশরীর প্রদর্শনের খেলাও চলছে। এমনও পরিবার আছে যাঁরা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিজেদের মেয়েকে অন্ধকার জগতে নামিয়ে দিতেও দ্বিধা করেন না। পরে সে সুস্থ জীবনে ফিরতে চাইলেও সমাজ তাকে স্বীকার করে না। সে দীনহীনার পাত্রী হয়ে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

অথচ নারী-পুরুষ দুই মিলেই পরিবার গড়ে তোলেন। সমাজের বিভিন্ন কাজ নারীর সহযোগিতায় সহজ হয়ে উঠেছে। মেয়েদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় শিক্ষিকারাই পরিচালনা করছেন। আবার মহিলা মহাবিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকা মিলে পরিচালনা করছেন। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ সবখানেই নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা নিতে গিয়েও শিশুকন্যারা নির্যাতিতা হচ্ছে। বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়েও তারা নির্যাতিতা হচ্ছে। আজ এই সমাজে কোনো মেয়েই সুরক্ষিত নয়। এমনকী এই মনুষ্যজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না বৃদ্ধারাও। এ আমাদের জাতির কলঙ্ক। আমরা এ কোন সমাজে বাস করছি? যেখানে নিজের পরিচয় দেওয়া লজ্জার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্কুলে-কলেজে-রাস্তাঘাটে তো মেয়েরা সুরক্ষিত নয়, মহিলারা কোনো প্রতিবাদ করলেও তাদের নির্যাতিত হতে হয়। মেয়েরা নিজের বাড়িতেও সুরক্ষিত নয়, কারণ পর্যাপ্ত বয়স না হতেই বা সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো ধারণা না জন্মাতেই বা নিজেকে উপযোগী করে না তুলতেই

অঙ্গনা

বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বে প্রতি ৩ জন বালিকাবধূর একজন ভারতের। শুধু তাই নয়, বাল্যবিবাহের নিরিখে ভারতের স্থান পৃথিবীতে ষষ্ঠ। ১৫ বছরের আগেই ২৭ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। ৩১ শতাংশ বিয়ে হয় ১৮ বছর হওয়ার আগে।

আমাদের সমাজের নজর মেয়েদের প্রতি খুব সঙ্কীর্ণ। এখনো মেয়েদের দায় ও বোঝাস্বরূপ মনে করা হচ্ছে। পরিবারের লোকজন দায় ও বোঝা থেকে খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পেতে চায়। এরকম মনোভাবের বিরোধিতা যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু সেটা কী সমাজের মনের কথা? না শুধু প্রবন্ধ লেখা বা আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য? ইউনিসেফের রিপোর্টে জানা যাচ্ছে আগামী ৫০ বছরেও ভারত বাল্যবিবাহ থেকে মুক্তি পাবে না। মানসিক ও শারীরিক পরিপূর্ণতার আগে মেয়েরা স্ত্রী ও মা হওয়ার যোগ্য হয় না, তবু এই অভিশাপ তারা বয়ে বেড়াচ্ছে।

দূরদূরান্তের গ্রামে তো বটেই আজকাল ছোট-বড় শহরেও বেশিরভাগ পরিবারেই কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া বাড়ছে বই কমছে না। সবচাইতে আশ্চর্যের কথা, যে মায়েদের কিছু বোঝার আগেই কম বয়সে বিয়ে হয়েছে, তারাও তাঁদের মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দিতে উৎসাহী। সমাজতত্ত্ববিদ ও মনস্তত্ত্ববিদরা এর কারণ অনুসন্ধান করলে ভাল হয়। তবে একথা নিঃসন্দেহে মানতে হবে যে, অশিক্ষার মতো সামাজিক চাপ ও নিরাপত্তার অভাব এর একটা বড় কারণ।

আর একটা বিষয়, শিক্ষিত যুবকরা শিক্ষার গুরুত্ব অনেক সময় ভুলে যান। তাঁরা শিক্ষিত হবার পর নিজেদের নৈতিক কর্তব্যবোধ ভুলে যান। তাই তো মেয়েদেরকে পণপ্রথার শিকার হতে হয়। বিবাহ একটা নৈতিক কর্তব্য এবং সেটাও তাঁরা অর্থের বিনিময়ে করে থাকেন। কখনও এই বিনিময় অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে। যেমন বাড়ি-গাড়ি বা লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে। হয়তো বা সেই জন্যই কন্যাসন্তানকে ছোট চোখে দেখা হয়। ফলস্বরূপ ভারতে পুরুষের তুলনায় নারীর অনুপাত উদ্বেগজনকভাবে কমছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৮২ সালে ১০০০ জন পুরুষে নারীর সংখ্যা ছিল ৯৬২ জন। তারপর তিন দশকে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ কন্যাভ্রূণ হত্যা হয়েছে। যার ফলে ২০১১ সালে ১০০০ জন পুরুষ নারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯১৮ জন।

আজ আমরা যে সমাজে বসবাস করছি সেখানে নারীরা কতভাবে অত্যাচারিত হচ্ছেন। কখনও শারীরিকভাবে কখনও মানসিকভাবে। পুরুষদের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটানো দরকার। নারীকে শুধু একটা মেয়ে না ভেবে একজন মানুষ অথবা মা হিসেবে ভেবে দেখুন। মা মমতার ভাণ্ডার, মা আমাদের জন্য কিনা করতে পারেন। মা'র সঙ্গে কি কখনও খারাপ ব্যবহার করা যায়? মেয়েদের নিজের মা, নিজের বোন, নিজের দিদি ভাবলে কুপ্রবৃত্তির উদয় হবে না।

সবচেয়ে বড় কথা, মেয়েদের আজ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে।

জমি আন্দোলনের ধ্বজাধারীরা ভুলে যাচ্ছে চাষির ছেলেও চাকরি চায়

অতিথি কলম

গুরুচরণ দাস

২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচনে দেশাবাসী মূল্যবৃদ্ধি কমাতে, দুর্নীতির দাপটে দেশের ডুবে যাওয়া আটকাতে, সর্বোপরি অগণিত কর্মহীনদের চাকরি জোটানোর আশায় নরেন্দ্র মোদীকে নির্বাচিত করেছিল। লক্ষ্য করা দরকার, গত ১০ মাসে কোনো দুর্নীতির খবর আসেনি, মূল্য বৃদ্ধিতেও যথেষ্ট লাগাম পড়েছে। কিন্তু চাকরির বাজারে খরা আদৌ কাটেনি। প্রধানমন্ত্রী নির্ভর করে আছেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের সাফল্যের ওপর। যাতে উৎপাদন শিল্পের পুনরুত্থানের ফলে লক্ষ লক্ষ চাকরির মুখ খুলে যায়।

> "প্রধানমন্ত্রী মোদী যে তাঁর সঙ্কল্পে সফল হবেন তার একটি ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে তাঁর 'ব্যবসা করার ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য' বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপে। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই লাল ফিতের ফাঁস আলগা করতে চাইছে। যাতে একটি কাগজ, একবারই টাকা দেওয়া আর একবারই মাত্র সরকারি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ হবে বিনিয়োগকারীর আর তাও সব সময়েই অনলাইনের মাধ্যমে।"

কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে যে এই উৎপাদন শিল্পে ব্যর্থতাই বার বার ভারতের বিশ্ব অর্থনীতিতে এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা হয়েছে। ১৯৯১ সালের সংস্কার পর্বের সূচনার সময় থেকেই দেখা গেছে, ভারতের উন্নয়ন হয়েছে মূলত পরিষেবা ক্ষেত্রের মাধ্যমে। ভাবতে ইচ্ছে করে ঠিক চীন যেমন ব্যাপক শিল্প বিপ্লব ঘটিয়ে ৪০ কোটি লোকের কর্মসংস্থান করতে পেরেছে প্রধানমন্ত্রী মোদী কি সেইভাবে পরিষেবা ক্ষেত্রের বাইরে যথার্থ উৎপাদন শিল্পের মাধ্যমে অর্থনীতির মোড় ঘোরাতে পারবেন? নিরাশাবাদীরা অবশ্যই বলবেন, না, এই শিল্প বিপ্লব এখন আর সম্ভব নয়। রোবেটিক্স, 3D Printing or digitally controlled laser ইত্যাদির আবিষ্কার ও প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন পদ্ধতি আজ এতটাই যান্ত্রিক দক্ষতার কবলে যে চিরাচরিত একজন অদক্ষ কৃষি শ্রমিকের পক্ষে দুম করে কোনো কারখানায় চাকরি নিয়ে সফলভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। এ ছাড়াও উৎপাদন শিল্পের সঙ্গে জড়িত চাকরির বাজার সম্প্রতি খরচ বৃদ্ধির কারণে চীন ছেড়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কিছু দেশে অনেক ক্ষেত্রে মেক্সিকোয় এমনকী বাংলাদেশের দিকে পাড়ি দিচ্ছে। অর্থাৎ উৎপাদকরা এই সব দেশেই কারখানা খুলছে তাদের লাভ-ক্ষতির হিসেব অনুযায়ী।

এমন একটা পরিস্থিতিতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে পরিকাঠামোগত সাপোর্ট, গত ইউপিএ সরকারের ট্যাক্স বা কর সন্ত্রাস ও ভয়ঙ্কর ভূমিনীতির ফলে বাস্তবে কোনো বিনিয়োগকারীর পক্ষে কোনো জমি জোগাড় করা সম্ভবই নয়। এগুলির সম্মিলিত প্রভাবে উন্নয়নের রাস অনেকদিনই ভারত ছেড়ে চলে গেছে।

অন্যদিকে আশাবাদীরা বলছেন, যতই উৎপাদন শিল্প তার অতীত গরিমা হারাক না কেন অথবা এই পথেই সর্বাধিক আয় করা আর সম্ভব না হোক, তবুও নতুন উদ্যমে চালিত উৎপাদন শিল্পের মাধ্যমেই দেশ এগিয়ে যেতে পারে। মোট জিডিপি (Gross Domestic Product)-এর অংশ হিসেবে উৎপাদন শিল্পের মাত্র ১৬ শতাংশ অংশগ্রহণ শতাংশের বিচারে অন্যান্য বাড়ন্ত অর্থনীতির তুলনায় একান্তই নগণ্য। তাই উৎপাদন শিল্পে বৃদ্ধির এখনও বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। আর এখানেই কৃষিক্ষেত্র থেকে সাধারণ মানের উচ্চ প্রযুক্তিহীন ছোট ও মাঝারি শিল্পদ্যোগ-গুলিতে শ্রমিকের ব্যাপক নিযুক্তি হতে পারে।

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার সূত্রে দেখা গেছে মূলত ২০০২ থেকে ২০১২ পর্যন্ত অর্থনীতির উচ্চহারে উন্নয়নের পর্বে ৫.১ শতাংশ শ্রমিক সংঘটিত শিল্পক্ষেত্রে চাকরিতে ঢুকেছে ও তারা অন্যান্যদের থেকে ৫ গুণ বেশি উৎপাদন দক্ষতা (productivity) দেখিয়েছে। এই শিল্পোনয়নের প্রতিফলন শ্রমিকের মুজরি বৃদ্ধি এমনকী গ্রামীণ শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। অবশ্য অত্যন্ত

উৎপাদন বিমুখ শ্রম আইন লাগু থাকায় তুলনামূলকভাবে অসংঘটিতক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। কোনো চাকরি না হওয়া বেকারির যন্ত্রণা থেকে অন্তত অসংঘটিত ক্ষেত্রের চাকরি তো মন্দের ভালো।

আমি কিন্তু আশাবাদীদের দলের সঙ্গেই আছি। আজ আচমকাই রেল ও প্রতিরক্ষার মতো মহাগুরুত্বপূর্ণ দপ্তর হঠাৎ চনমনে হয়ে উঠেছে। তাদের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ধন্যবাদ অবশ্যই প্রাপ্য মোদী সরকারের এই দু'টি দপ্তরের এবং সেইসঙ্গে ভারপ্রাপ্ত দু'জন অসাধারণ মৌলিক ভাবনায় সমৃদ্ধ মন্ত্রীর। এর প্রথম নিদর্শনই পাওয়া যায় রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভুর দূরদর্শী প্রথম রেল বাজেটেই। অন্যদিকে প্রতিরক্ষা দপ্তরের মনোহর পারিকারের ভারতকে অস্ত্র সম্ভারের বৃহত্তম আমদানিকারক দেশ থেকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর এক সামরিক শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকারের সুবাদে আজ বহু ভারতীয় সংস্থাই শুধু নয়, বহু উন্নত দেশও তাদের প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতে অস্ত্র কারখানা গড়তে এগিয়ে আসছে। এগুলির ফল রাতারাতি দেখা যায় না।

একটি তৃতীয় সম্ভাবনা বিপুল সাফল্য নিয়ে ভারতের বাণিজ্য জগতে স্থায়ী আস্তানা গড়তে চলেছে তা 'e Commerce'। আগামী তিন বছরের মধ্যে এই পদ্ধতিতে ১০ মিলিয়ন চাকরি তৈরির সম্ভাবনা বাস্তবের মুখ দেখবেই। তথাকথিত সুপার মার্কেট থেকেও একই সঙ্গে মনোহারী দোকানের খুচরো কেনাবেচার ক্ষেত্রগুলি থেকে এক লাফে 'অন লাইন রিটেলিং'-এ এমনই অসংখ্য নবীন প্রজন্মের যুবক যুবতী শুধু নয়, প্রবীণরাও অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। এখানে ক্রীত দ্রব্যের ওপর ব্যাপক ছাড় পাওয়া যায়, কেননা বিক্রেতাকে কোনো স্টল দিতে হয় না, দিতে হয় না ভাড়া বা সেলামি। ঠিক যেমনভাবে দেশে ল্যান্ডলাইন থেকে সেল ফোনগুলি অগ্রাধিকারে চলে এসেছে।

এখানে প্রধানমন্ত্রী মোদী যে তাঁর সঙ্কল্পে সফল হবেন তার একটি প্রধান ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে তাঁর 'ব্যবসা করার ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য' বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপে। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই লাল ফিতের ফাঁস আলগা করতে চাইছে। যাতে একটি কাগজ, একবারই টাকা দেওয়া আর একবারই মাত্র সরকারি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ হবে বিনিয়োগকারীর আর তাও সব সময়েই অনলাইনের মাধ্যমে।

প্রসঙ্গত আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় ফর্মের সংখ্যা নয় থেকে কমিয়ে তিন করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকার নতুন ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে অতীতে চালু থাকা প্রয়োজনীয় অনুমোদনের সংখ্যা এক ধাক্কায় অর্ধেক করে দিয়েছে। ওদিকে পাঞ্জাবের রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ দপ্তর থেকেই বিদ্যুৎ বিষয়টা আলাদা করে আক্ষরিক অর্থে একটি বাড়ির মধ্যেই বিদ্যুৎ উদ্যোগ সম্পর্কিত যা কিছু অনুমোদন 'এক জানালা' পদ্ধতিতে দেওয়া চালু করেছে। তবে এই নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে তাক লাগিয়ে দিয়েছে অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা। তারা কারবার সংক্রান্ত একটি e-biz portal খুলেছে যেখান থেকে সরাসরি ১৪ ধরনের প্রয়োজনীয় পরিষেবা ও অনুমোদন একই সঙ্গে পাওয়া যাবে। বিশাল চমক অপেক্ষা করে আছে— যখন খুব শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী সমস্ত রাজ্যগুলিতে পর্যাপ্ত খোঁজ খবর ও তথ্যের ভিত্তিতে ঘোষণা করবেন 'ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্যের' বিনিয়োগকারীদের কাছে কোন রাজ্য সবার আগে। ধুন্দুমার একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার একটি সংকেত ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কী ভারতে অতীতে কখনই নতুন চাকরি সৃষ্টি করার জন্য কোনো সরকারকেই জরুরি তাগিদের ভিত্তিতে মরিয়া হয়ে উঠতে দেখা যায়নি। দেশের বাজেটেও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বেশ বড় অর্থের জোগান নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে অর্থ দপ্তর তারা প্রাথমিক শর্ত পূরণ করেছে। কিন্তু এর মধ্যেও কায়েমি স্বার্থ তৎপর হয়ে উঠেছে। আর বিরোধী পক্ষ আদাজল খেয়ে জমি বিলের বিরুদ্ধে শিল্পের বিরুদ্ধে কৃষককে লড়িয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু তারা হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে বা নিজেদের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার খাতিরে ভুলে যাচ্ছে— (১) কৃষকের ছেলেরও চাকরির দরকার আছে। (২) সরকারের আনা অধ্যাদেশের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মাত্র এক একর জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রেও ন্যূনতম ১০০টি সই ও ৫০ মাসের আবশ্যিক অপেক্ষার ফাঁস কাটাতে হবে। এগুলি সবই নথিভুক্ত আছে ২০১৩-এর আইনটিতে। সেগুলি থেকে মুক্তি পেতেই এই অধ্যাদেশ। মোদী যদি এ কাজে সাফল্য আনতে পারেন তাহলে দু'টি পুরস্কার অপেক্ষা করে আছে— ভারত সাক্ষী হবে এক অভূতপূর্ব শিল্প বিপ্লবের এবং জনসংখ্যার মধ্যে দেখা দেবে এক বিপুল জীবিকা পরিবর্তনের প্রতিফলন।

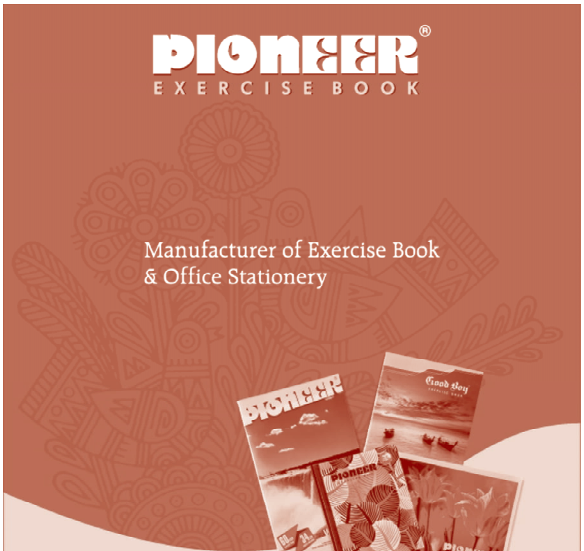

'ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান'-এ ভূষিত দীননাথ বত্রা

বিশ্বকে পথ দেখানোর জন্য ভারতকে দাঁড়াতে হবে : মোহন ভাগবত

"মৃত্যুর আগে তাঁর নাম বিশেষ কেউ একটা জানতো না। কিন্তু আজ তাঁর প্রতিষ্ঠিত কাজের মাধ্যমে তাঁর নাম সারা বিশ্ব জেনে ফেলেছে। বীজ মাটিতে মিশে গিয়ে যে গাছ উৎপন্ন হয় তাকে সবাই দেখতে পায়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার সেই বীজ। বিশ্বকে পথ দেখানোর জন্য ভারতকে উঠে দাঁড়ানোর কাজ তিনি শুরু করে গিয়েছেন।" গত ১২ এপ্রিল কলকাতার কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় আয়োজিত 'ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান' অনুষ্ঠানে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে একথাগুলি বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহনরাও ভাগবত। কুমারসভা পুস্তকালয় এবার 'ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান' প্রদান করে প্রখর রাষ্ট্রবাদী চিন্তক ও লেখক তথা 'শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সমিতি'র রাষ্ট্রীয় সংযোজক দীননাথ বত্রাকে। সঠিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য দেশে ও বিদেশে শ্রীবত্রা আজ একটি পরিচিত নাম।

শ্রী ভাগবত বলেন, 'দেশের স্বাধীনতার জন্য এদেশের বীর সন্তান ও মনীষীরা মরণপণ লড়াই করেছেন। ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে আমাদের দেশের মহাপুরুষরা দেশের উত্থানের জন্য কাজ করেছেন। ইংরেজরা ভারতকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিকৃত করেছে। সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিজাতীয় মানসিকতাসম্পন্ন লেখকরা আমাদের দেশের বিপ্লবীদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়ে ইতিহাসের বই লিখেছেন। শ্রী বত্রা এর বিরুদ্ধে মামলা করে ও আন্দোলন সংঘটিত করে সেই বিকৃত ইতিহাসকে বাতিল করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছেন।" শ্রী ভাগবত আরও বলেন, শ্রী বত্রা এখানেই থেমে না থেকে শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের গৌরবগাথা ও চরিত্রগঠনকারী পাঠক্রম চালু করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। তাতে বামপন্থী ও ছদ্মসেকুলার বুদ্ধিজীবীরা গৈরিকীকরণের অভিযোগ তুলেছেন।" শ্রী ভাগবত জোরের সঙ্গে বলেন, "দেশের বর্তমান প্রজন্মকে যদি সঠিক ইতিহাস জানানো গৈরিকীকরণ হয়, তাহলে এই গৈরিকীকরণ অভিনন্দন যোগ্য। আর শ্রী বত্রা ডাঃ হেডগেওয়ারের ভাবনার প্রতিফলিত রূপ। তাঁকে প্রজ্ঞা সম্মান জানানোর অর্থ ডাক্তারজীর আদর্শকে সম্মান জানানো।"

সম্মান প্রদানের প্রত্যুত্তরে শ্রী বাত্রা বলেন, সঠিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজ দেশমাতৃকার পূজা— এই ভাব নিয়েই করে চলেছি।" তাঁর মতে, শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের কাজ শিক্ষাবিদদের হাতে থাকা চাই, রাজনীতিবিদদের হাতে নয়। দেশের ভাবী প্রজন্মকে সত্যিকারের 'মানুষ' তৈরি করার মতো শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া চাই।

শ্রী দীননাথ বত্রাকে 'ডা: হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান - ২০১৫' -এ ভূষিত করছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহনরাও ভাগবত। মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন দুর্গা ব্যাস, মোহনলাল পারিক, লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা, অজয় নন্দী, প্রভাত কুমারজী, যুগলকিশোর জৈথলিয়া, ড. মুরলীমনোহর যোশী, মহাবীর বজাজ, ডা. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী এবং বিমল লাঠ।

অনুষ্ঠানে বিশ্বের অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রভাত প্রকাশনের ব্যবস্থা নির্দেশক প্রভাত কুমার। সভাপতি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা সাংসদ ড. মুরলীমনোহর যোশী। সভাপতির ভাষণে ড. যোশী জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারত কত উন্নত ছিল এবং আজও সারা পৃথিবী কীভাবে তা স্মরণ করে তার উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিশিষ্ট নাট্যকর্মী বিমল লাট এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুস্তকালয়ের বর্তমান প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী যুগলকিশোর জৈথলিয়া।

‘সত্য ইতিহাস পড়ানো যদি গৈরিকীকরণ হয়, তাহলে তা খুবই জরুরি’

শিক্ষা জগতে দীননাথ বত্রা আজ সুপরিচিত একটি নাম। প্রথমে বিদ্যাভারতীর রাষ্ট্রীয় মহামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে ‘শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন’ এবং ‘শিক্ষা সংস্কৃতি উত্থান ন্যাস’-এর রাষ্ট্রীয় সংযোজক হিসেবে সারা দেশে ভ্রমণ করছেন। গত ১ এপ্রিল কলকাতায় এসেছিলেন। স্বস্তিকার প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছিলেন। সেই বার্তালাপটি এখানে প্রকাশ করা হলো।

■ আপনি অনেক বছর থেকে ‘শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন’ এবং ‘শিক্ষা সংস্কৃতি উত্থান ন্যাস’-এর রাষ্ট্রীয় সংযোজক হিসেবে কাজ করছেন। এ দু’টির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি?

■ আমি প্রথমে বিদ্যাভারতী-র দায়িত্বে ছিলাম। বিদ্যাভারতীর বিদ্যালয়ে প্রিন্সিপালরূপে কাজ করেছি। পরে বিদ্যাভারতীর মহামন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছি। অবসর নেওয়ার পর শিক্ষা বিষয়ে পড়াশুনা শুরু করি। দেখি NCERT-র পুস্তক সমূহে ছাত্রছাত্রীদের দেশাত্মবোধ, চরিত্র গঠন, নীতিশিক্ষার মতো বিষয়গুলি নেই। তাছাড়া এদেশের বিপ্লবী যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে ভুল তথ্য পড়ানো হচ্ছে। বিশেষ করে ইতিহাস পুস্তকে ছাত্রছাত্রীদের মনে দেশের সম্পর্কে হীন ভাবনা নির্মাণ করা হচ্ছে। আমার মনে হলো, দেশের ভাবী প্রজন্মকে বাঁচাতে হবে। তখন শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন শুরু করি। প্রথমে ইতিহাসের ভুল তথ্য সম্পর্কে শিক্ষিত লোকদের সজাগ করা ও খবরের কাগজে লেখালেখি শুরু করি। তাতে কাজ কিছু না হওয়ায় NCERT-র বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করি।

শুনলে লোকে অবাক হবে যে সরকার তথা NCERT-র পক্ষে অর্থাৎ আমার বিপক্ষে বর্তমান আপ-এর নেতা প্রশান্তভূষণজী উকিল হিসেবে লড়েছেন। আদালতের নির্দেশে আমরা আংশিক সফল

হই। NCERT ৭৫ শতাংশ বিকৃত অংশ পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দিয়েছে।

NCERT-র পুস্তকগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের দেশাত্মবোধ ও চরিত্র নির্মাণের মতো কোনো বিষয়ই ছিল না, বরং নানা অপশব্দ যা পড়তে ও শুনতে লজ্জাবোধ হবে তা ছিল। এর ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতি দুটোই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। শুধু তো আন্দোলন করলে হবে না, ছাত্রছাত্রীদের সংস্কৃতিবান করার লক্ষ্যে সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য শিক্ষা সংস্কৃতি উত্থান ন্যাস তৈরি করা হয়। এর দ্বারা পাঠ্যক্রমের বিকৃতি ও ভুল ভ্রান্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানো হচ্ছে। শুধু ছোট ছোট ভুলভ্রান্তি সংশোধনের মধ্যেই আমরা সীমাবদ্ধ নই, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আমাদের দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, পরম্পরা, ব্যবস্থা ও মহাপুরুষদের অপমান করার যে ষড়যন্ত্র চলছে তা রুখতে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

■ এর আগে আপনি বিদ্যাভারতীর মহামন্ত্রীরূপে (জেনারেল সেক্রেটারি) কাজ করেছেন। দেশে বিদ্যাভারতীর প্রভাব এখন কীরকম?

■ এখনকার কথা বিদ্যাভারতীর বর্তমান কার্যকর্তারা সঠিক তথ্য দিয়ে বলতে পারবেন। বিদ্যাভারতী একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। দেশের মধ্যে সংবেদনশীল এলাকা যেমন—মাওবাদ বা নকশাল অধ্যুষিত এলাকা, সীমাবর্তী এলাকায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ শুরু করা হয়। এখন মনে হয় সারাদেশে ২৩ হাজারের বেশি শিশুমন্দির ও বিদ্যামন্দির চলছে। প্রায় ৩৪ লক্ষ ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করছে। ১লক্ষ ৪৫ হাজারের বেশি শিক্ষক ও শিক্ষিকারা পঠনপাঠনের কাজ করছেন। বিদ্যাভারতীর কাজ দেশের দুর্গম স্থানে পৌঁছে গেছে। সব স্থানে বড় বড় স্কুলবাড়ি তৈরি করা সম্ভব নয়। পাহাড়ের ওপর যেখানে লোকেরা ছাগল, ভেড়া চরানোর কাজ করে এমন স্থানে ১ জন শিক্ষকও ৫০ জন ছেলেমেয়েকে পড়ানোর কাজ করছেন। সেগুলি একল বিদ্যালয়। আশ্চর্যের কথা, জম্মু-কাশ্মীরের মতো পাহাড়ি রাজ্যে ২৮টি বড় বিদ্যালয় ও ১ হাজারের বেশি একল বিদ্যালয় চলছে। সারা দেশে সমস্ত রাজ্যে আজ বিদ্যাভারতীর স্কুলের মাধ্যমে দেশের ছেলেমেয়েরা নৈতিক শিক্ষা, চরিত্র নির্মাণের শিক্ষা ও দেশাত্মবোধের শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। আপনার শুনলে ভাল লাগবে, বিদ্যাভারতীর বিদ্যালয়ে বৈদিক গণিতের মতো বিষয় পড়ানো হচ্ছে। দেশে ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী বৈদিক গণিতে পারদর্শী

হয়েছে। আমাদের ইচ্ছা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক বৈদিক গণিতকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করুক। শিক্ষা শুধু বেঁচে থাকার জন্যই নয়, জীবনের অঙ্গ। বিদ্যাভারতীর শিক্ষাব্যবস্থাকে দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ দু' হাতে আশীর্বাদ করছেন।

২০০২ সালে আপনার পক্ষ থেকে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। এ বিষয়ে কিছু বলবেন?

কংগ্রেস তো মেকলে ও মার্কসের শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করছিল। আমরা বিদ্যাভারতীর বিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় শিক্ষা অর্থাৎ চরিত্র গঠন ও নীতি শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে পাঠক্রম রচনা করেছি। সে সময় কংগ্রেসের অধিবেশনে বিদ্যা ভারতীর পাঠক্রমকে সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ও গৈরিকীকরণের অভিযোগ তোলা হয়। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছিল চরিত্র নির্মাণ ও নীতি শিক্ষা কোনো দোষের নয়।

সমাজতত্ত্ববিদদের বক্তব্য যে, ছাত্রছাত্রীদের যৌনতা বিষয়ে সচেতন করার জন্য বিদ্যালয়ে Sex Education চালু করা প্রয়োজন। কিন্তু আপনার বক্তব্য— There should be no sex education in schools. এর কারণ কি?

প্রথম কথা, যাঁরা স্কুলে যৌনশিক্ষা চালু করার জন্য ওকালতি করছেন তাঁরা সমাজতত্ত্ববিদ নন। তাঁরা মার্কস ও মেকলের পুত্র। তাঁরা দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নষ্ট করার পক্ষে। আচ্ছা, 'মা' বললে আমাদের মনে কোন চিত্র ভেসে ওঠে। পরম শ্রদ্ধেয়, পরম সম্মানের মায়ের চিত্র ভেসে ওঠে কিনা। সেরকমই যৌনতা বিষয়ে আলোচনায় মানুষের আদিম প্রবৃত্তি জেগে উঠবে। এ একটি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়া। এ আপনা থেকেই সঠিক সময়েই বিকশিত হয়। শিক্ষা মানে জ্ঞানের প্রকাশ। সেক্স বিষয়ে বেশি কথাবার্তায় সুকুমার বৃত্তির ছাত্রছাত্রীদের মন কলুষিত হয়ে উঠবে, ফলে বিকৃত ভাবনার জন্ম হবে। সেজন্য আমরা যৌন শিক্ষার বিপক্ষে। আমরা দেশাত্মবোধ, চরিত্রনির্মাণ ও নীতি শিক্ষার পক্ষে। যৌন বিষয়ে আলোচনায় মনে ওই বিষয়ে ছবি নির্মাণ হবে এবং মন সেভাবেই গঠিত হবে। এটা কখনোই কাম্য নয়।

গুজরাটে রাজ্য সরকার ৪২ হাজার স্কুলে আপনার লিখিত পুস্তক পাঠক্রমে যুক্ত করেছে। বিরোধীরা বলছে, ওই বই বিজ্ঞানসম্মত বা ইতিহাসসম্মত নয়, গৈরিকিকরণ মাত্র। আপনার বক্তব্য?

একেবারে মিথ্যা কথা। আমার লেখা কোনো বই গুজরাটের স্কুলে পড়ানোর কথাই হয়নি। আসলে শিক্ষা বিষয়ে আমার লেখা একটি অনুবাদ পুস্তক তারা স্কুলের লাইব্রেরিতে রেখেছে। সেখানে আরো অনেক লেখকের বইও আছে। টাইমস অফ ইন্ডিয়া সে সময় লিখেছিল— 'বত্রা শিক্ষার পক্ষে খতরা'। গুজরাট সরকার তাদের বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা, চরিত্রগঠনের শিক্ষা পাঠ্যক্রমে চালু করাতেই এত হৈচৈ।

দেশাত্মবোধ জাগরণ, চরিত্র নির্মাণ ও নীতি শিক্ষার বিষয়গুলি যদি গৈরিকীকরণ হয়, তাহলে তো এটা খুব ভালো। হলুদ ও লাল মিলেই গেরুয়া হয়। হলুদ ব্রহ্মতেজ ও লাল ক্ষাত্র তেজের প্রতীক। ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রতেজে উদ্বুদ্ধ সমাজ আমাদের দেশে এখন প্রয়োজন। এতে লাভ বই ক্ষতি নেই। সত্য ইতিহাস পড়ানো যদি গৈরিকীকরণ হয় তাহলে তা খুবই জরুরি।

হরিয়ানা সরকার আপনাকে তাদের শিক্ষা কমিটিতে রেখেছে। সেখানে আপনি উপদেষ্টা রূপে আছেন। ওই রাজ্যে শিক্ষায় আপনি কী কী পরিবর্তন এনেছেন?

আমি অনেক বছর শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছি। তাই তারা আমাকে কমিটিতে রেখেছে। আমার চিন্তাভাবনার সঙ্গে তারা সহমত পোষণ করে। তারাও চায় পাঠক্রমে দেশাত্মবোধ, চরিত্র নির্মাণ ও নীতি শিক্ষার প্রয়োজন আছে। রাজ্যের শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা সেভাবে পাঠক্রম রচনা করছেন।

বামপন্থীদের দ্বারা লিখিত NCERT-র পুস্তকে এদেশের বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী বলা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আপনি মামলা করেছিলেন। পুস্তক থেকে অপমানের বিষয়গুলি বাদ দেওয়া হয়েছে কি?

বামপন্থীরা খাঁটি মার্কস্ ও মেকলের পুত্র। এদেশের গৌরবময় সব কিছুকে নষ্ট করে ফেলাই তাদের একমাত্র কাজ। NCERT-র পুস্তকে তারা লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ভগৎ সিং-কে সন্ত্রাসবাদী বলে উল্লেখ করে। শিখগুরু তেগবাহাদুরকে লুঠেরা বলে ইতিহাসের বইতে উল্লেখ করে। এর বিরুদ্ধে শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলনের পক্ষে মামলা করা হয়। আদালতের নির্দেশে ৭৫ ভাগ এরকম বিষয় বাদ দেওয়া হয়েছে।

আপনার মতো সব দেশভক্তেরই দাবি, বিকৃত ইতিহাসের পুনর্লিখন হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে কি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?

যা ঘটেছে তার সঠিক বর্ণনাই হলো ইতিহাস। বিকৃত ইতিহাস পড়ালে ছাত্রছাত্রীদের মনে হীনভাবনা উৎপন্ন হয়। ইতিহাস শুধু সাল-তারিখের কচকচি নয়। অতীত গৌরবে ভাবী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করা। প্রথম এনডিএ সরকার ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কিশোর বয়সের বিপ্লবীর চরিত্র ইতিহাসের পাঠক্রমে স্থান দেওয়া মনস্থ করে। তারা আমাকেই এ দায়িত্ব দেয়। বিদ্যাভারতীর কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় আমি সারা দেশের কার্যকর্তাদের এ বিষয়ে জানাই। তারা ২৮ জন কিশোর বিপ্লবীর নাম ও জীবনী পাঠায়। বিদ্যাভারতীর বিদ্যালয়ে এটা পড়ানো হচ্ছে। ইতিহাস সঙ্কলন যোজনার মাধ্যমে সঠিক ইতিহাস লেখা ও গবেষণার কাজ চলছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত আপনার লেখা বইকে Not history but fantasy বলা হচ্ছে। ঐতিহাসিকের পরিভাষা কি?

দেশের গৌরবময় ইতিহাসের অধ্যয়ন মেকলে পুত্রদের কাছে fantasy। ঐতিহাসিক তাঁরাই যাঁরা দেশের অতীতকে যথাযথ ভাবে তুলে ধরবেন। দেশের সম্পর্কে হীন ভাবনা যাঁরা নির্মাণ করেন তাঁরা আর যাই হোন ঐতিহাসিক নন।

আপনার এসব কাজের প্রেরণা কী?

দেশমাতৃকা। পুত্ররূপে আমি দেশামাতৃকার কাজ করছি। দেশের ছেলেমেয়েরা দেশের জন্য বাঁচতে শিখুক। স্বামীজী বলেছেন, একটা দাগ রেখে যা। গীতা নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছে। এসবই আমার প্রেরণা। এই কাজেই আমার রুচি। সংস্থার নামেই আমার রুচির পরিচয় পাওয়া যাবে।

আন্তর্জাতিক যোগদিবসে ভারতসংস্কৃতির বৈচিত্র্য তুলে ধরা হবে বিশ্বের কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রথম আন্তর্জাতিক যোগদিবস পালন হবে বড় মাপে ২১ জুন। ইন্ডিয়ান কাউনসিল ফর কালচারাল রিলেশনস (আই সি সি আর) উদ্যোগ নিয়ে বিশ্বের ৩৭টি জায়গায় যোগ চর্চার শিবির আয়োজন করছে। ভারত সরকারের অনুমোদন পাবার পর পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠন। যাদের মধ্যে আছে ইসকন, ভারতীয় বিদ্যাভবন, শ্রীশ্রী রবিশংকরের আর্ট অফ লিভিং, বাবা রামদেবের পতঞ্জলি যোগকেন্দ্র ও রামকৃষ্ণ মিশন। যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের যোগাসন ও ব্যায়ামের অনুশীলন হবে। বলা হয়েছে, এর মধ্যমে তুলে ধরা হবে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতীয় পরম্পরা অনুসরণ করেই এই আয়োজন।

ঋষিকেশ ও হরিদ্বার শহরে যেসব যোগ প্রশিক্ষণকেন্দ্র রয়েছে সেগুলি আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে যোগাসনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্যোগে সহযোগীর ভূমিকা নেবে।

আই সি সি আর যে ৩৭টি কেন্দ্র বেছে নিয়েছে সেগুলি ছাড়াও ভারতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র রয়েছে এমন আরও ১০০টি দেশে যোগ- উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। যেসব বিদেশি যোগচর্চা ধারবাহিকভাবে করছেন তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হবে নিজেদের অনুশীলনের অভিজ্ঞতা বলার জন্যে। যোগদিবসকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্যে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিদেশ থেকে আসবেন বিখ্যাত মানুষরা যাঁদের যোগচর্চায় বিশেষ পরিচিতি রয়েছে।

এই উদ্যোগে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন তুলসী গাবার্ড। তিনি হলেন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের একমাত্র হিন্দু ও ডেমোক্রেট সদস্য। আমেরিকায় ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ চর্চায় তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। যোগকে বোঝার ক্ষেত্রে যে সাফল্য এসেছে তাতে তুলসী গাবার্ড পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগদিবস ঘোষণা করেছে। আই সি সি আর যোগচর্চাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে চায়। সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে। যোগচর্চার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা সম্ভব।

আই সি সি আর-এর সভাপতি লোকেশ চন্দ্র বলেছেন, ‘রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্তাব্যক্তিরা আমার সঙ্গে দেখা করেছেন আর আলোচনা করেছেন ওই বিষয় কিছুদিন আগে। বিস্তৃত কর্মসূচি সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। যা চূড়ান্ত রূপ নেবে এমাসের শেষে।’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আন্তর্জাতিক যোগদিবস উপলক্ষে তাঁর পরামর্শ ও বক্তব্য জানাবেন যার বড় ভূমিকা থাকবে বিশ্ব যোগচর্চায়। দক্ষ যোগ বিশারদের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হচ্ছে শুধু যোগ শেখানোর জন্যে নয়, তাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতিকেন্দ্রর মাধ্যমে যোগচর্চার দার্শনিক দিকগুলোও তুলে ধরবেন জিজ্ঞাসুজনদের কাছে। এছাড়া লিখিত বিবরণ ও ভিডিও মাধ্যমে যোগ অনুশীলনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হবে। যোগ নিয়ে আলোচনাও হবে। মোদী সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করেছে অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ যোগ স্থাপনের। যোগচর্চার পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে ‘যোগ অনুশীলন’কে আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে বিদেশিদের কাছে। উল্লেখ্য, ২০ জন কলকাতায় বাগবাজার ফণীভূষণ মঞ্চে বিকালে এক যোগ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

মাটির রেফ্রিজারেটর 'মিট্টিকুল'

মনসুখভাই ও তাঁর তৈরি মিট্টিকুল ফ্রিজ।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গ্রীষ্মের দাবদাহে এবার হাঁসফাঁস করার পালা। তাই বাড়িতে থাকা প্রয়োজন একটি অত্যাধুনিক ফ্রিজ। যাতে জল থেকে ফল, তরিতরকারি ঠাণ্ডা এবং সতেজ থাকে। বাজারে নামীদামি কোম্পানির ফ্রিজ অনেক পাওয়া যায় এবং দামও খুব একটা কম নয়। সঙ্গে চাই বৈদ্যুতিক সংযোগ। যা না থাকলে ফ্রিজটাই অচল। কিন্তু যদি হয় এমন এক ফ্রিজ যার বিদ্যুতের প্রয়োজন নেই, দামও সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে। বৈদ্যুতিন ফ্রিজে যে সমস্ত সুবিধা মেলে তার সবকটি মিলবে এখানে। এরকমই এক মাটির ফ্রিজ তৈরি করেছেন মনসুখভাই প্রজাপতি। যাঁর তৈরি মাটির ফ্রিজের নাম 'মিট্টিকুল'।

মনসুখভাই প্রজাপতি গুজরাটের নিচিমগুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গুজরাটের প্রজাপতি পরিবার পরম্পরায় টেরাকোটার কাজের সঙ্গে যুক্ত। দরিদ্রপরিবারের চার সন্তানের মধ্যে মনসুখভাই সব থেকে বড়। সুতরাং পরিবারের দায়িত্ব তাঁর উপরও অনেকটা বর্তায়। দশম শ্রেণী অনুত্তীর্ণ মনসুখভাই পরিবারের হাল ধরতে ইঁট ভাটায় কাজে লাগেন। পরবর্তীকালে জগদম্বা মাটি-কারখানায় শিক্ষানবীশ হিসাবে টানা তিনবছর কাজ করেন মনসুখভাই। তবে কাজ করতে করতে নতুন কিছুর জন্য ভাবতে দেখা যেত মনসুখভাইকে। তাঁর মাথায় চিন্তা একটি প্লেট তৈরির কারখানা করার। কাজও শুরু করেন তিনি। প্লেট তৈরির পাশাপাশি ওয়াটার ফিল্টার, হট প্লেট, প্রেসার কুকারও তৈরি করেন তিনি। যা সবকিছুই মাটির তৈরি। তবে এইভাবে তাঁর ব্যবসা যখন রমরমিয়ে চলছে তখনই এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হন মনসুখভাই। ২০০১ সালে গুজরাটের ভূমিকম্পে তাঁর ব্যবসার ব্যাপক ক্ষতি হয়। তাঁর তৈরি করা জিনিসপত্র ও কাঁচামালের বেশিরভাগ নষ্ট হয়ে যায়। এই ঘটনার মাসখানেক পরে গুজরাটের একটি দৈনিক সংবাদপত্র সন্দেশে মনসুখভাইয়ের একটি ভাঙা ওয়াটার ফিল্টারের ছবি দিয়ে তার নিচে ক্যাপশন দেওয়া হয় 'দি পুওর ম্যানস ব্রোকেন ফ্রিজ'। যা দেখে মনসুখভাই অনুপ্রাণিত হন। এবং তাঁর আর এক নতুন ভাবনার উন্মেষ ঘটে। তিনি ঠিক করেন বিনা বিদ্যুতের মাটির ফ্রিজ তৈরির কথা। এর প্রায় বেশকয়েক বছর পর ২০০৫ সাল নাগাদ তিনি ফ্রিজ তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। ব্যাঙ্কে পৈতৃক ভিটে বন্ধক দিয়ে ঋণ গ্রহণ করেন। মনসুখভাই 'মিট্টিকুল' ফ্রিজ বানাতে মাটি তৈরি করতে পরিবারের সাহায্য নেন। মিট্টিকুল ফ্রিজ পুরোপুরিভাবে টেরাকোটার কাজ করা এবং ফ্রিজে দেওয়ালে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র রয়েছে। যার কারণ ফ্রিজের ভিতর ও বাইরের হাওয়া চলাচল করার ফলে ভিতর ঠাণ্ডা থাকে। তাতে ১০ লিটার জল অনায়াসে মজুত করা যায়। বাষ্পীভবনের মাধ্যমে জল ঠাণ্ডা হয়ে যায়। জলের মতো যে কোনো ধরনের পানীয় পাঁচ দিন মজুত করে রাখা যায়। এই মিট্টিকুলের দাম সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। মাত্র ২৫০০-৩৫০০ টাকা। ইতিমধ্যেই দেশে মিট্টিকুল নিয়ে সাড়া পড়ে গেছে। গরম বাড়ার পাশাপাশি মিট্টিকুলের চাহিদাও বাড়ছে বলে জানান বছর ৪৯-এর মনসুখভাই। মনসুখভাইয়ের এই প্রয়াস দেখে অনুপ্রাণিত হন আমেদাবাদ আই আই এম-এর অধ্যাপক অনিল গুপ্তা। অধ্যাপক গুপ্তা তাঁকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দেন এই ব্যবসাকে আরও সবল করতে। সেই সঙ্গে তাঁর আত্মবিশ্বাসকে। ফ্রিজের পাশাপাশি মাটির তৈরি তাওয়া, প্রেসারকুকার, নন-স্টিক কড়া, ওয়াটার ফিল্টার এবং ডিনার সেটও তৈরি করছেন মনসুখভাই। এই সমস্ত মাটির জিনিসের চাহিদা সম্পর্কে তাঁকে জিগ্যেস করা হলে তিনি বলেন, 'দিন দিন ক্রমশ এর চাহিদা বাড়ছে। ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকার বিক্রি হয়েছিল। তারপর থেকে ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ আয়ও বেড়েছে। যদিও আজকের এই সাফল্য একদিনে তার কাছে আসেনি।

মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ মনসুখভাই শিক্ষানবীশ হিসাবে মাটি-কারখানায় যখন এসেছেন সেদিন থেকেই তার পরিশ্রম চলতে থাকে। আজ সেই পরিশ্রমের ফল পাচ্ছেন মনসুখভাই। এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষ থেকে মনসুখভাইকে ১০০টি মিট্টিকুল তৈরির অর্ডার দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ২ লক্ষ টাকা অগ্রিম। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'ভাগ্যের চাকা এখন ঘুরছে'। বর্তমানে মনসুখভাই মাটির ফ্লাস্ক তৈরি করার চিন্তাভাবনা চালাচ্ছেন। দু'টি মডেলে তৈরি হবে ১ লিটার ও ২ লিটারের। আবার মিট্টিকুলের মধ্যেও নতুনত্ব আনতে চাইছেন তিনি। ৫ মিনিটে ঠাণ্ডা করার ফ্রিজ এবং ২ মিনিটে ঠাণ্ডা করার ফ্রিজ। মিট্টিকুল সহ একাধিক মাটির জিনিস তৈরি করে চমকে দেওয়ায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম তাঁকে প্রকৃত বিজ্ঞানী বলে সম্মানিত করেছেন।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast

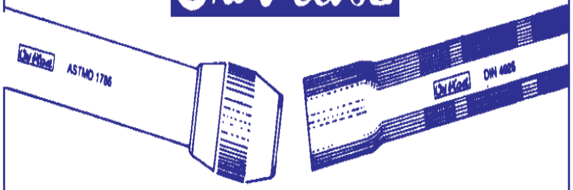

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"মুক্ত অভিমান আমাদের মুক্ত করে। আধ্যাত্মিক জগতেও 'আমরা মুক্ত' এই বিশ্বাস আমাদের মুক্তির পথে অগ্রসর করবে। প্রকৃত বিশ্বাস, জ্ঞানের সমীপবর্তী অবস্থা ছাড়া আর কি? জ্ঞানের পূর্ণতাই উপলব্ধি।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পুস্তক প্রসঙ্গ

আকর্ষণীয় নজরুল জীবনী : চিত্রে ও ছড়ায়

রমাপ্রসাদ দত্ত

বামপন্থীরা একসময় রবীন্দ্র বিরোধিতার বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন এই বঙ্গে। তারপর হঠাৎ চৈতন্যোদয় হতে কিংবা অন্য কোনো মতলবি উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রভক্তির আতিশয্য প্রদর্শন শুরু হয়। সেই সঙ্গে আর একটা কৌশলের প্রয়োগে তৎপরতা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে সুকান্ত ভট্টাচার্যের নাম জুড়ে দিয়ে জন্মদিন পালনের হিড়িক ফেলে দেয়। প্রচারের ঢাক ভালোমতোন বাজানো শুরু হয়। এই ধরনের কাণ্ডকারখানা জীবদ্দশায় দেখতে হয়নি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে। দেখলে অবশ্যই লজ্জায় মাথা হেঁট করতেন সুকান্ত নিজে। তিনি লিখেছিলেন, 'আমার প্রার্থনা শোনো' পঁচিশে বৈশাখ / তুমি আর একবার জন্ম দাও রবীন্দ্রনাথের।' রবীন্দ্রনাথের প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা ছিল সুকান্তর। তিনি যদি জানতেন উত্তরপুরুষ রাজনীতির অঙ্ক কষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত করে প্রচারের ঢাক পেটাবে, তাহলে তিনি এমন কোথাও গিয়ে মুখ লুকোতেন, যেখানে তাঁকে সহজে খুঁজে পাওয়া সহজ হোত না। পরে বামপন্থীদের মধ্যে দেখা যায় অন্য খেলা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুল-এর নাম জুড়ে প্রচার। দুজনেই বড় লেখক। দুজনের অবস্থান দু' জায়গায়। নজরুল নিজে কখনো মেনে নিতে পারতেন না রাজনীতির লোকদের ওই ওজন করা শ্রদ্ধা প্রকাশ।

নজরুলের জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরা। অতি সাধারণ পরিবারে তাঁর জন্ম। কলমকে আঁকড়ে ধরে কাজ করে গেছেন বিভিন্নরকম প্রতিকূলতার মধ্যে। তিনি ছোটদের লেখক, বড়োদেরও। সঙ্গীতকার, সুরস্রষ্টা। দেশপ্রেমের প্রবল আবেগে লিখে গেছেন কবিতা ও গান। তাঁর জীবন কথাকে নানাভাবে তুলে ধরার উদ্যোগ দেখা গেছে। এই বইয়ে নজরুলকে নিয়ে লেখা ছড়া অনেকগুলো। নজরুলের ছোটবেলার কথা বলেছেন। ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার তাঁর জন্ম। বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে। ফকির কাজী তাঁর বাবা, মা জাবেদা। আট বছর বয়সে পিতৃহীন। দশ বছর বয়স থেকে আয়ের ব্যবস্থা করতে হয় তাঁকে। কারণ বাড়িতে কয়েকটি মানুষ তাঁর দিকে তাকিয়ে। বালক বয়সে লেটোর দলে ঢুকে বেশ কিছু গান শিখলেন। কিন্তু বাড়িতে অন্ন জোটে না। স্কুল ছেড়ে কাজের খোঁজে হাজির কয়লাকুঠির দেশে। কয়লা খাদানের পাশে কষ্ট করে জীবনযাপন। এক সময় মেরুদণ্ড সোজা রেখে বলতে পারলেন কর্মদাতাকে, 'আমি চললাম। একটি মানুষকে যথাযথ মর্যাদা দিতে জানেন না।'

গোলামি ছেড়ে অন্য কাজের খোঁজ শুরু। কাজ মেলে। কিন্তু সেখানে অপমানও কম নয়।

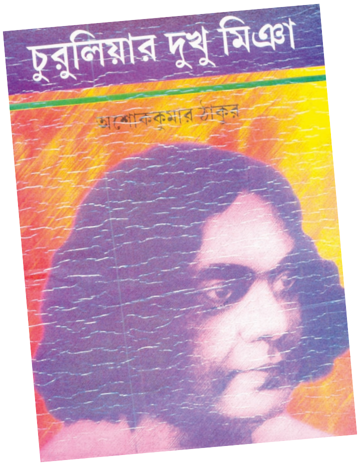

নজরুল মন বসাতে পারেননি কোনো জায়গায়। নতুনভাবে পড়াশোনা শুরু। তার মধ্যেও আবার এলোমেলো হয়ে যায় জীবনধারা। কাব্য গানে ডুবে থাকে মন। যোলর বালক কথায় সুরে মাতায় ত্রিভুবন। ছন্দে বলে একজায়গায়, পড়াশোনার ইচ্ছে দারুণ। হয় না তবু পড়া। ব্যথায় জলে ডুবে মরে। পায় না খুঁজে ধরা।' শিয়রসোল স্কুলে পড়ার সময় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। লেখাপড়ার পর্ব মোটামুটি শেষ করে যৌবনের দিন এলো। প্রথম মহাযুদ্ধ। শৈলজা নজরুল দুজনেই যুদ্ধে যেতে চান। শেষ পর্যন্ত শৈলজার যাওয়া হয়নি। নজরুল যান। বাঙালি রেজিমেন্টের সৈনিক হয়ে রণাঙ্গনে ঘুরছেন। ফিরে এলেন স্বদেশে। আপনজনেরা নতুনভাবে কাছে টেনে নিলেন তাঁকে। যুবক নজরুলের বুক ভরা ভালোবাসা দেশের জন্যে চোখে স্বপ্ন। লিখতে থাকলেন। এরপর তাঁর বিদ্রোহী কবি পরিচয় পাওয়া। লেখা চলতে থাকল। ধূমকেতু কাগজ রেরোল। রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ জানালেন ধূমকেতু সম্পাদককে। ইংরেজ শাসকরা কারাবন্দী করল তাঁকে। শক্তিমান কবিকে কী আটকে রাখা যায় বন্দীশালায়! শাসকের অত্যাচারের প্রতিবাদে কঠোর অনশন। রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ করলেন 'অনশন বন্ধ করো। দেশ তোমাকে চায়। অনেক কাজ করার আছে।'

জেল থেকে ছাড়া পেলেন কিছুদিন বাদে। কিন্তু নতজানু হলেন না শাসকের কাছে। অগ্নিবর্ষী লেখা বেরিয়ে এলো একটার পর একটা। একই সঙ্গে গান। জীবনে কষ্ট পেয়েছেন কম নয়। গানে গানে তা ধরা আছে। লেখার মধ্যে সংগীত ভাবনার মধ্যে নিজেকে নতুনভাবে ফিরে পেলেন। কিন্তু লেখকের তো তৃপ্তি নেই। তিনি সতত জিজ্ঞাসু মন নিয়ে এগিয়ে চলতে চাইলেন। ১৩৪৮ এর ২২ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু। নিমতলা শ্মশানে বসে লিখলেন 'রবিহারা' কবিতা। অসাধারণ সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানালেন অনুজকবি। এর কিছুদিন বাদে নজরুলের অসুস্থতা। অনেক চিকিৎসার উদ্যোগ নেওয়া হলো। কিন্তু কিছুই হলো না। ৩৫ বছর চেতনাহীন জীবন কেটেছে। জীবনাবসান ১৯৭৬ এর ২৯ আগস্ট। ছড়ায় নজরুলের জীবন কথা বলা হয়েছে সুন্দরভাবে। শেষ অংশে আছে : 'থাকে যদি বাংলা ভাষা/ ফোটে যদি ফুল/ বঙ্গভাষীর হৃদয় জুড়ে/ থাকবে নজরুল।' অশোক কুমার ঠাকুর এর লেখা ছড়ার সঙ্গে ছবি এঁকেছেন ধীরেন শাসমল। বইটির ভূমিকা লিখেছেন কল্যাণী কাজী। নজরুলের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ। বইটি ছোটোদের ভালো লাগবে, বড়োদেরও।

চুরুলিয়ার দুখু মিঞা। অশোক কুমার ঠাকুর। ছোটদের কচিপাতা ৩৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা। দাম ৩০ টাকা। ■

সমাবেশ সমাচার

মরণোত্তর অঙ্গদান সংক্রান্ত আলোচনা সভা

গত ৮ মার্চ ননীভূষণ সিংহ মেমোরিয়াল হলে (শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি) শরৎ সরকার ট্রাস্ট আয়োজিত মস্তিষ্কের মৃত্যুর পর অঙ্গদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান সংক্রান্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভা ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার দানে উৎসাহ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টি কল্যাণী সরকার। স্বাগত ভাষণ দেন অন্যতম ট্রাস্টি সুদীপ্ত সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ও কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করেন ট্রাস্টি কাঞ্চন ভট্টাচার্য। মরণোত্তর চক্ষুদানের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করেন শিবপুর আলোক বার্তার পক্ষে শ্রীকান্ত দে। অঙ্গদানের বিশদ্ ব্যাখ্যা করেন বিশিষ্ট অস্থি বিশেষজ্ঞ ডাঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ডাঃ মুখোপাধ্যায় মস্তিষ্কের মৃত্যুর পর অঙ্গদান সর্বাধিক ৩৪ জন মৃত্যুপথযাত্রীকে যে নবজীবন দেওয়া সম্ভব তা সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করেন এবং সকলকে অনুধাবনের জন্য অনুরোধ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সহ-সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজসেবী অ্যাডভোকেট তপন কুমার নাগ। শ্রী নাগ তাঁর ভাষণে আগামী প্রজন্মের চরিত্র গঠন এবং পরপোকারী মানসিকতায় আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের এবং মহাভারত ও গীতার অংশ ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সমাজসেবী তথা হাওড়া মহানগরের সঙ্ঘচালক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে ট্রাস্টের কর্মসূচির এবং আজকের এই অবক্ষয়ের যুগে ট্রাস্টের প্রচেষ্টা এবং মানসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করেন। এরপর হাওড়া সদরের ১৫টি স্কুলের ২৯ জন দশম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পদক, পুস্তক ও মিষ্টান্ন দিয়ে উৎসাহিত করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরু বন্দেমাতরম্ ও সমাপ্তিতে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারুভাবে পরিচালনা করেন স্বয়ংসেবক কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য।

কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় শিক্ষক সঙ্ঘের জেলা সম্মেলন

গত ২২ মার্চ কৃষ্ণনগর বিবেকানন্দ ভবনে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের নদীয়া জেলার পঞ্চম বার্ষিক জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জেলার প্রতিনিধিদের উদ্দেশে স্বাগত ভাষণ দেন জেলা সম্পাদক গৌতম পাল। প্রদেশের সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, শাশ্বত মূল্যবোধ ও শিক্ষা জগতে ভারতের পরম্পরাকে মর্যাদা দিতে হবে। প্রদেশের সংগঠন সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র পাল সংগঠনের অগ্রগতি, শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন প্রতিনিধিদের সামনে। প্রদেশের সহ-সভাপতি পঙ্কজ নিয়োগী প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সভায় সভাপতি রূপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুবলচন্দ্র সরকার।

সম্মেলনে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক -শিক্ষিকা এবং শিশুমন্দিরের আচার্য-আচার্যাদের নিয়ে মোট ৮২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে স্কুল ভিত্তিক পাঠ্যসূচি জাতীয়ভাবনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে— এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের দ্বারা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পুরুলিয়ায় বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের সভা

গত ১৫ মার্চ পুরুলিয়া জেলার সঙ্ঘ কার্যালয়ে বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের উদ্যোগে শিক্ষকদের একটি সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের প্রাদেশিক সভাপতি এবং বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের প্রাদেশিক তত্ত্বাবধায়ক অবনীভূষণ মণ্ডল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ-ব্যবস্থা প্রমুখ অশোক সাহা, বাঁকুড়া বিভাগ সঙ্ঘচালক অসিত কুমার দে প্রমুখ।

অশোক সাহা বৈদ্যুতিন চ্যানেলের ধারাবাহিক চাণক্যর উদাহরণ দিয়ে বলেন, একজন শিক্ষক চাইলে সমাজের দুরবস্থা বদল করতে পারেন। সভা সঞ্চালন করেন বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের পুরুলিয়া জেলা সভাপতি পার্থ গঙ্গোপাধ্যায়। পুরুলিয়া জেলার দশটি ব্লকের শিক্ষক প্রতিনিধিগণ এই সভায় অংশগ্রহণ করেন।

বারাকপুরে গণ উপনয়ন

গত ২৯ মার্চ বারাকপুর পুরোহিতমণ্ডলীর উদ্যোগে এক গণ-উপনয়ন দানের আয়োজন করা হয়। আর্থিকভাবে দুর্বল ব্রাহ্মণ সন্তানদের জন্য এই গণ উপনয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তালপুকুর জিমন্যাসিয়াম ক্লাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বারাকপুর শহর ছাড়াও সোদপুর, মোহনপুর, পাতুলিয়া পঞ্চায়েত থেকে ১৯ জন ব্রাহ্মণ সন্তান এই উপনয়ন অনুষ্ঠানে

অংশগ্রহণ করে। উপনয়নের যাবতীয় খরচ বারাকপুর পুরোহিতমণ্ডলীর পক্ষ থেকে করা হয়েছিল। গত বছর বারাকপুর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে আয়োজন করা হয়। এই বছর দ্বিতীয় বর্ষে পড়ল। আগামী দিনেও এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে বলে মণ্ডলীর পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের প্রধান আচার্য সম্মেলন

বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের তত্ত্বাবধানে জয়গাঁতে উত্তরবঙ্গের সরস্বতী শিশুমন্দিরগুলির প্রধান আচার্যদের সম্মেলন গত ১৯ থেকে ২২ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অখিল ভারতীয় সহ-প্রশিক্ষণ সংযোজক অশোক পণ্ডা। উদ্বোধনী বক্তব্যে অশোক পণ্ডা বিদ্যালয় সংগঠনে এবং বিদ্যালয় ও সংকুলস্তরে প্রশিক্ষণ বিষয়ে প্রধান আচার্যদের ভূমিকা সম্পর্কে বলেন। এছাড়া ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক গোবিন্দ চন্দ্র মহন্ত, বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের সভাপতি বিশ্বনাথ গরাই, সম্পাদক পরিমল রায় কোঙার, সংগঠন সম্পাদক পার্থ ঘোষ বর্গে সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব ক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক গোবিন্দ চন্দ্র মহন্ত বিদ্যালয়ে আর্থিক, শৈক্ষিক এবং বার্ষিক কার্যক্রম ও অবকাশ পরিকল্পনা গ্রহণ করার পদ্ধতি ও তাৎপর্য প্রধান আচার্যদের সামনে তুলে ধরেন।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিদ্যাভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থানের সংগঠন সম্পাদক প্রকাশ চন্দ্রজী উপস্থিত ছিলেন। সমারোপ বক্তব্যে প্রকাশজী বিদ্যাভারতীর আচার্যদের গুণগত মান বৃদ্ধি, শিক্ষা নিয়ে চিন্তন করা, লেখা, স্বাধ্যায় এবং সমাজ সংগঠনের ভাবনার কথা তুলে ধরতে হবে বলে পরামর্শ দেন এবং সকলকে কাজের জন্য আরও সময় দেওয়ার কথা বলেন। সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের মোট ৭৮টি স্থান থেকে ৮২ জন প্রধানাচার্য-প্রধানাচার্যা ও সহ-প্রধানাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রাদেশিক বৈঠক

গত ৫ এপ্রিল রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের প্রাদেশিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়, সমিতির কলকাতা কার্যালয়ে। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কার্যকর্ত্রীরা এই বৈঠকে যোগ দিতে আসেন। অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ সুনিতা হলদেকর, ক্ষেত্র কার্যবাহিকা মহুয়া ধর, প্রান্ত কার্যবাহিকা ঋতা চক্রবর্তী-সহ প্রান্তের কার্যকর্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি জয়পুরে আয়োজিত অখিল ভারতীয় কার্যকর্ত্রী বৈঠকে গৃহীত পরিকল্পনা অনুসারে প্রান্তের আগামী কর্মসূচি এদিনের বৈঠকে নির্ধারিত হয়। এছাড়া সমিতির আসন্ন গ্রীষ্মকালীন শিক্ষণ শিবিরের (২৫ মে, ২০১৫—৯ জুন '১৫; সিউড়ি) প্রস্তুতি বিষয়ে আলোচনা হয়।

আমতায় বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সেবাকাজ

গত ২৯ মার্চ হাওড়া জেলার আমতা ২নং ব্লকে সন্তোষনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সহায়তায় একটি চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ওই শিবিরে ১৩২ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয় ও ১০৫ জনকে চশমা প্রদান করা হয় বিনামূল্যে। এছাড়াও কয়েকজন চিকিৎসক ৪০ জনের স্বাস্থ্য, ২০ জনের ফুসফুস এবং ২০ জনের অস্থি পরীক্ষা করেন ও বিনা ব্যয়ে ঔষধ প্রদান করা হয়।

বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ পরিচালিত দক্ষিণবঙ্গের সরস্বতী শিশু মন্দিরগুলির শিশুদের বার্ষিক ক্রীড়া

প্রতিযোগিতা মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর এফ ইউ সি মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ড. নির্মল কুমার সাহা পতাকা উত্তোলন করার পর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় ও শেষে পুরস্কার বিতরণ হয়। প্রধান অতিথি প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক দুর্গাদাস রায়চৌধুরী মূল্যবান ভাষণ প্রদান করে উপস্থিত সকলকে উৎসাহিত করেন। বিশেষ অতিথি ক্রীড়াবিদ প্রবীর কুমার ভদ্র ও শিক্ষক জগন্ময় চক্রবর্তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কার ভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত বৈঠক

গত ৭ এপ্রিল শিলিগুড়ির মাধবভবনে উত্তরবঙ্গ সংস্কার ভারতীর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় সহ-সংগঠন সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণমূর্তি। এছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলনিধি

বাঁকুড়া জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হেত্যাপুকুর শাখার স্বয়ংসেবক শিবম্ মাহাতোর শুভ বিবাহ উপলক্ষে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন তাঁর মা বর্ধমান ও বীরভূম বিভাগ সেবা প্রমুখ প্রফুল্ল ঘোষের হাতে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নদীয়া বিভাগ প্রচারক উত্তম মাহাতো, বাঁকুড়া বিভাগ প্রচারক আশিস পাল, বাঁকুড়া জেলা প্রচারক ভীষ্মদেব মণ্ডল, সহ-জেলা প্রচারক সৃজন হাজরা এবং বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক। উল্লেখ্য, শিবম মাহাতো নদীয়া বিভাগ প্রচারক উত্তম মাহাতোর সহোদর।

***

বাঁকুড়া জেলার খাতড়ার স্বয়ংসেবক মহাবীর চক্রবর্তীর কন্যা শ্রীতমার শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে গত ২২ মার্চ তার ঠাকুরদা দানীমোহন চক্রবর্তী মঙ্গলনিধি প্রদান করেন প্রবীণ প্রচারক তথা ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রান্ত সহ-সংগঠন সম্পাদক অমল ঘোষের হাতে। অনুষ্ঠানে বিভাগ প্রচারক, জেলা প্রচারক-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

***

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক শিশির বসু তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ উপলক্ষে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দিরের প্রধানাচার্য উজ্জ্বল নায়কের হাতে। অনুষ্ঠানে জেলা প্রচারক অর্জুন বিশ্বাস-সহ বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

***

বহরমপুর নিবাসী লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী সুধাংশু বিশ্বাসের কনিষ্ঠ পুত্রের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে গত ৪ মার্চ মঙ্গলনিধি প্রদান করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈত চরণ দত্ত এবং বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

***

গত ২২ মার্চ বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর শাখার স্বয়ংসেবক তরুণ কোটালের পুত্র অর্ণব কোটালের শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তাঁর মা জেলা কার্যবাহ তরুণ লায়েকের হাতে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহ-জেলা প্রচারক সৃজন হাজরা, জেলা সেবা প্রমুখ শিশির গঙ্গোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুর মহকুমা কার্যবাহ জয়ন্ত শীল প্রমুখ।

তমাল চক্রবর্তীর অকাল প্রয়াণ

স্বস্তিকা পত্রিকার কর্মী তমাল চক্রবর্তী গত ২ এপ্রিল ২০১৫, বৃহস্পতিবার ভোর ৪টায় পরোলোকগমন করেন। তমাল স্বস্তিকার কর্মীবৃন্দের মধ্যে কনিষ্ঠতম এবং সদালাপী হওয়ার কারণে সকলের প্রীতিভাজন ছিলেন। বর্ধমানের কুকড়া কৃষ্ণপুর গ্রামনিবাসী তপন চক্রবর্তী মহাশয়ের একমাত্র সন্তান তমাল বি.সি.এ-র ছাত্র ছিলেন। পড়াশুনা ছাড়াও সামাজিক কাজে তাঁর স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় পুরোহিতের কাজ করতেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর অকাল মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছানোমাত্র সেখানে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। আমরা তমালের

আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং প্রার্থনা করি ভগবান তাঁর পিতা-মাতা এবং পরিবারস্থ সকলকে এই শোক সহ্য করার শক্তি প্রদান করুন।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাটোয়া শাখার স্বয়ংসেবক তথা প্রাক্তন প্রচারক এবং বর্তমানে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রাদেশিক কোষাধ্যক্ষ অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতৃদেবী সুনীতি বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৯ মার্চ ৮১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি ২ পুত্র ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

***

কোচবিহার মহারানা শাখার স্বয়ংসেবক অশোক ঠাকুরের মাতৃদেবী জ্যোতিপ্রভা ঠাকুর গত ৩০ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি ২ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন।

***

হাওড়া জেলার শ্যামপুর রায়নগরের স্বয়ংসেবক দেবাশিস সামন্ত'র বাবা গত ১৭ মার্চ ৮০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

তাইকোন্ডোর আন্তর্জাতিক বাঙালি দম্পতি

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাইকোন্ডো খেলাটির সঙ্গে অধিকাংশ ভারতবাসীর তেমন বড় একটা সখ্য গড়ে ওঠেনি। মার্শাল আর্টের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ 'ফর্ম' তাইকোন্ডোর সঙ্গে কেরালার কলারি নাট্যমের অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষের শারীরিক সক্ষমতা যেমন বাড়িয়ে দেয় তেমনি উন্নত মনন ও বোধবুদ্ধির বিকাশ সাধন করে কোরিয়াজাত এই মার্শাল আর্ট। কথা হচ্ছিল তাইকোন্ডোর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্রীড়াবিদ প্রদীপ্ত কুমার রায়ের সঙ্গে সল্টলেকের সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাটে বসে। প্রদীপ্তর স্ত্রী রুমাও এই খেলাটিতে যথেষ্ট কৃতবিদ্য। অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদক জিতেছেন রাজ্য ও দেশের হয়ে, এককথায় খেলাটির এক সেলিব্রিটি দম্পতি। প্রদীপ্ত তাইকোন্ডো খেলাটিকে তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে স্থান দিয়েছেন। খেলতে খেলতেই কোচিংয়ের ভাবনা মাথায় আসা এবং তার ফলশ্রুতির 'রয়্স্ তাইকোন্ডো আকাদেমি'। যেখানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন আগামী দিনের শত শত প্রদীপ্ত, রুমা। কোরিয়ার নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতি হলেও আবিশ্ব এর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছে। বেশ কয়েক বছর আগেই অলিম্পিক সংসারে ঢুকে পড়েছে। আর সম্প্রতি 'অলিম্পিক হল অব ফেম' সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়েছেন প্রদীপ্ত, যা যে কোনো ক্রীড়াবিদের জীবনে পরমপ্রাপ্তি। উল্লেখ্য, ২০১২-র লন্ডন অলিম্পিকে আর সব ইভেন্টের থেকে তাইকোন্ডো দেখেছে সবচেয়ে বেশি দর্শক। যে কোনো মাল্টি স্পোর্টস ইভেন্টে তাইকোন্ডো এক বড় আকর্ষণ টিভি ও কোর্টের দর্শকদের কাছে। মাস্টার প্রদীপ্ত ও তার সুযোগ্য সহধর্মিণী রুমাদেবী মনে করেন প্রতিটি অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের তাইকোন্ডো প্রশিক্ষণ নেওয়া উচিত। কারণ আত্মরক্ষা করতে শেখায়, শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির চালিকা শক্তি এই খেলাটি। আর মানব মনের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সখ্য গড়ে তোলে। মানুষ দায়িত্ব ও সমাজ সচেতন হয়ে ওঠে এই খেলাটি যদি ঠিকঠাক চর্চা করা যায়।

তাঁর আকাদেমি কোরিয়ার গিয়ং গি-ডো তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে 'মৌ' স্বাক্ষর করেছে, যা এই দেশে তাইকোন্ডো চর্চার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা বলে মনে করেন প্রদীপ্ত। এর ফলে এদেশের যোগ্য শিক্ষার্থীরা কোরিয়ায় গিয়ে উন্নত ও অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে। ভবিষ্যতে এশিয়াড অলিম্পিয়ার্ড থেকে পদক জিততে সক্ষম হবে তারা।

'হল অফ ফেম' অনুষ্ঠানে কোরিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টারের সঙ্গে প্রদীপ্ত কুমার রায় ও রুমা রায়।

কোরিয়ার এই আকাদেমির বহু ছাত্রছাত্রী বিশ্ব ও অলিম্পিক চাম্পিয়ন হয়েছে। আর প্রদীপ্তর তাইকোন্ডো আকাদেমি কুক্কিওন বিশ্ব তাইকোন্ডোর অনুমোদনও পেয়ে গেছে। কুক্কিওন তাইকোন্ডোর সদর দপ্তর দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে অবস্থিত। আই ও সিতে কুক্কিওন আক্সিকের তাইকোন্ডোই সর্বোচ্চ মাত্রার। ভারতের অন্যতম আন্তর্জাতিক মাস্টার প্রদীপ্ত এই বিশ্ব সংস্থার কাছ থেকে ডান সার্টিফিকেটও পেয়ে গেছেন। আর 'হল অব ফেম' যে কোনো খেলায় আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ অবদানের জন্য দেওয়া হয় যা ইতিমধ্যেই তার ড্রয়িংরুমের শো-কেসে শোভা পাচ্ছে। প্রদীপ্তর আগে কোনো ভারতীয় অলিম্পিক অন্তর্ভুক্ত ইভেন্টে এই বিশেষ খেতাব পাননি। তার সঙ্গে একই সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়েছে রুমাকেও।

'হল অব ফেম' পুরস্কার গ্রহণ করে দেশে ফিরে আসার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ নিজের বাসভবনে তাঁদের সম্বর্ধনা দেন। এরপর এই রাজ্যের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীও তাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এরপর এই দম্পতি আর এক দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জন করেন। আন্তর্জাতিক তাইকোন্ডোর টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসর মনোনীত হন। যা খেলাটির 'হল অব ফেম'-এর অ্যাডভাইসরি কমিটির আলঙ্কারিক পদ। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা তাদের এই আভিধানিক স্বীকৃতির পর বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন সভা মঞ্চে। এর পরের বছরে প্রদীপ্ত বিশ্ব তাইকোন্ডো লিডার্স ফোরামের (কুক্কিওন ফর্ম) নিয়মিত সদস্য আর রুমা সহযোগী সদস্য মনোনীত হন। আন্তর্জাতিক তাইকোন্ডের গুটিকয়েক ব্যক্তিত্ব এই কীর্তির অধিকারী। এতসব আইভরি কীর্তিকল্প নিজের মাথার মুকুটে ধারণ করার পরও মাটির মানুষ প্রদীপ্ত। রামকৃষ্ণ মিশন ও আর এস এসের আদর্শকে ধরে নিজের জীবনবৃত্তটি গড়ে নিয়েছেন। তাইকোন্ডো বা যে কোনো ধরনের মার্শাল আর্ট যে জীবনকেই শেখায়। এই চিন্তাধারার সঙ্গে মিশন ও আর এস এসের কর্মপদ্ধতির অনেক মিল খুঁজে পান প্রদীপ্ত। তাই কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন সঙ্ঘের শাখা সংগঠন ক্রীড়াভারতীর যে কোনো রকম ক্রীড়া উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। এছাড়া তার স্বপ্ন রাজ্যের সর্বত্র কুক্কিওন তাইকোন্ডোকে ছড়িয়ে দেওয়া। প্রতিটি স্কুল, ক্লাব, সামাজিক সংগঠন যাতে খেলাটির চর্চা ও প্রসারে আগ্রহী হয় তার জন্য তাদের যা যা করণীয় তা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতি যোগাসনকে যদি সারা বিশ্ব অন্তর থেকে গ্রহণ করে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনচর্চায় অঙ্গীভূত করতে পারে তাহলে চীন-কোরিয়ার মার্শাল আর্টকে নিয়ে কেন ভারতবর্ষ জগৎসভায় উজ্জ্বল অবস্থানবৃত্ত তৈরি করতে ব্রতী হবে না? ∎

শব্দরূপ-৭৪৩ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

■	■	১			২	■	৩
৪	৫		■	■		■	
■		■	৬	■	৭	৮	
■	৯			■	■		■
■		■	■	১০			■
১১		১২	■		■		■
	■		■	■	১৩		
	■	১৪				■	■

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. রাবণের মামা (হনুমানকে না মেরেই মনে মনে নিজের পুরস্কার স্বরূপ লঙ্কাভাগ করেছিল), **৪.** গায়ক ভিক্ষু সম্প্রদায় বিশেষ, **৭.** প্রণম্য, পূজনীয়, **৯.** যযাতির পিতা, **১০.** 'এসেছে—, হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে', **১১.** অর্জুনের ধনু, **১৩.** শোধক, যে পবিত্র করে; অগ্নি, **১৪.** মন্দগতি ভারবাহী নৌকা।

উপর-নীচ : ১. সময়; যম, **২.** রাশিচক্রের তৃতীয় রাশি, **৩.** সমবয়সী বন্ধু, সখা, **৫.** অপব্যয়ী, **৬.** রাশিচক্রের প্রথম রাশি, **৮.** বৃক্ষ উৎসব, 'মচ্ছব', **১০.** সত্যজিৎ রায়-সৃষ্ট প্রফেসর চরিত্র, **১১.** শিব, মনসা ইত্যাদির উৎসব, **১২.** লাগাম, রশ্মি, **১৩.** ভাঁজ, স্তর ('কাপড়—করা')।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৪০

য	■	■	প	রা	শ	র	■
ব	■	■	সা	■	ম্বু	■	■
ন	ট	ব	র	■	ক	ম	লা
■	ন	■	■	■	■	হা	■
■	ট	■	■	■	■	বী	■
ব	নে	দী	■	ক	ল	র	ব
■	■	প	■	রা	■	■	শি
■	ব	ন	মা	লী	■	■	ষ্ঠ

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৭৪৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ৪ মে ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। বান্দা বৈরাগী।। ২১

২০১৯ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের উজ্জ্বল উপস্থিতি

গত ২৬ মার্চ নয়া দিল্লীর শ্রীরাম কলেজের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আই এম এফ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস্টিন লগার্ড। বিশ্ব অর্থনীতির বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আই এম এফ-এর প্রধান এদিন বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের উজ্জ্বল উপস্থিতির ভূয়সী প্রশংসা এবং তা কীভাবে সম্ভব হয়েছে সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 'বর্তমানে যেখানে বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা গরিবিরেখার নিচে অবস্থান করছে সেখানে ভারত এক উজ্জ্বল পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করছে। এক্ষেত্রে নীতি সংশোধন এবং ব্যবসায়িক উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়েছে বলেই অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হয়েছে।' এই প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান, চলতি অর্থবৎসরের ন্যায় ভারতের জিডিপি ২০১৯ সালে ৭.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে চীন এবং জার্মানির জিডিপি-কে অতিক্রম করবে। অর্থাৎ বিশ্বের অন্যান্য দেশ অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে যেখানে নিচের দিকে অবস্থান করবে, ভারতকে তার ঠিক উল্টোদিকে অবস্থান করতে দেখা যাবে। সেই সঙ্গে লগার্ডের কথাতে বোঝা যায় তিনি বিশ্বাস করেন ভারতের এই অর্থনৈতিক উন্নতি বিশ্ব অর্থনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

সাগরমালা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সারাদেশে এখন যে ৭০০ জনবসতিশূন্য দ্বীপ রয়েছে, সেগুলিকে পর্যটনস্থল হিসেবে গড়ে তুলতে সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার সাগরমালা নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্প অনুসারে ওই দ্বীপগুলিকে পর্যটনের উপযোগী আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য চলচিত্র নির্মাণ ও অন্যান্য বিনোদনমূলক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। সামুদ্রিক নিরাপত্তাও এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। সৌর ও বায়ুচালিত শক্তিই এইসব কাজে ব্যবহার করা হবে।

সম্প্রতি ক্যাবিনেটে এই প্রকল্প শুরুর ক্ষেত্রে সম্মতি জানিয়েছে। এই সাগরমালা প্রকল্পটির ভাবনা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী-র ভাবনাপ্রসূত। উল্লেখ্য, আমাদের দেশের মোট ১২০৮টি দ্বীপ রয়েছে। এর মধ্যে ১৮৫টি দ্বীপে আলোকস্তম্ভ রয়েছে যা জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে কাজে লাগে।

কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী নীতিন গডকরি জানিয়েছেন, সাগরমালা প্রকল্পের অধীনে দেশের ১২টি বন্দরে ঘিরে স্মার্ট সিটি তৈরি করা হবে।

রাষ্ট্রীয় সেবাযজ্ঞ

দেশের বনবাসী সমাজের উত্থানের জন্য বনবাসী কল্যাণ আশ্রম তাদের রাষ্ট্রীয় সেবাকাজের জন্য সমাজের সহৃদয় ব্যক্তিদের থেকে স্বেচ্ছাদান গ্রহণ করে থাকে। তার দ্বারা বনবাসী সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সামাজিক চেতনাবোধ জাগরণের কাজ হয়। রাষ্ট্রপ্রেমী বন্ধুদের সহায়তায় গত ৬২ বছর ধরে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম এই কর্মযজ্ঞ পালন করে চলেছে। জনজাতি বন্ধুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রতি দায়বদ্ধ কল্যাণ আশ্রম আজ বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় জনজাতি সেবা সংগঠন। বর্তমানে সারাদেশে ৭৯৬ জন পুরুষ ও ১৯২ মহিলা পূর্ণকালীন এবং কয়েক হাজার অংশকালীন ধ্যেয়নিষ্ঠ কার্যকর্তার মাধ্যমে শিক্ষা, চিকিৎসা, সংস্কার ও স্বাবলম্বনের কাজে ১৭৯২০টি সেবা প্রকল্প চলছে। ৫২,২২৩টি বনবাসী গ্রামকে কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তারা সেবার আওতায় এনেছেন।

আমেরিকাতে রঙীন বসন্ত

বসন্তের হোলি উৎসবে মেতেছিল আমেরিকার উপসাগরীয় অঞ্চল। ৭ মার্চ মিলপিটার্সের কারডোজা পার্কের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে প্রায় ১০ হাজার ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকাবাসী হোলি উদ্‌যাপনে সামিল হয়েছিল। এই বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেছিল ফেডারেশন অফ ভারতীয় আমেরিকানস অফ নর্দান ক্যালির্ফোনিয়া এবং ফ্রেমন্ট হিন্দু মন্দির। এই দুই সংস্থার উদ্যোগেই হোলি উৎসব পালন হয়। 'দ্য ফ্রি ফেস্টিভ্যাল' নামের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় আয়োজক সংস্থার পরিবার-পরিজন, পুণ্যার্থী এবং ওই এলাকার স্থানীয় মানুষজনদের। যারা একে অপরের গায়ে নানান রঙের আবির ছিটিয়ে বিভিন্ন সুরে সঙ্গীতের তালে তালে উৎসবে মেতে ওঠেন।

ভারতী বংশোদ্ভূত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক হুসেন ওবামার মন্ত্রণালয়ে যে সমস্ত সচিব রয়েছেন তার মধ্যে বেশ কয়েকটি উচ্চ পদে রয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা। তবে এবার নবতম সংযোজন হলো রাষ্ট্রদূত হিসাবে। সম্প্রতি ভারতীয় বাংশোদ্ভূত অতুল কেশপকে শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। এর আগে অতুল বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিক পদে ছিলেন। এছাড়াও তিনি দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়া বিষয়ক দপ্তরের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ওবামা প্রশাসনের দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ার দায়িত্বে থাকা আর এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিশা দেশাইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসাবেও তিনি কাজ করেছেন। সুতরাং অতুল কেশপ নতুন দায়িত্ব তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী পাওয়া দরকার ছিল যা তিনি পেয়েছেন। অতুল-সহ আরও তিনজনের সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমি গর্বিত যে এঁদের মতো প্রতিভাধারীরা আমাদের দেশের হয়ে পরিষেবা প্রদান করবেন। আমি আশাবাদী প্রশাসনিক কাজে এঁদের পূর্বেকার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা কাজ করবেন। আমি নিজেও এঁদের সঙ্গে কাজ করতে উদ্‌গ্রীব।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
20 April - 2015 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা